ক্রুসেড-১৩
পাপের ফল
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন

ক্রুসেড - ১৩

পাপের ফল

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ মোবাইলঃ ০১৭১৭৪৩১৩৬০

ক্রুসেড - ১৩

পাপের ফল

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ মোবাইলঃ ০১৭১৭৪৩১৩৬০

পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১২
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০২
প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-13
Paper Phal
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, 01717431360
5th Edition : February 2012
Published on: March 2002

PRICE : 50.00 TAKA

ISBN 984-581-187-6

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼দুর্গম পাহাড় ▼ ভন্ডপীর ▼ ছোট বেগম ▼ রক্তস্রোত ▼ রিচার্ডের নৌবহর ▼ মহাসমর

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– 'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত▼ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ ▼ রক্তাক্ত প্রাচীর ▼ অশান্ত চীন সাগর

মেয়েদের সাথে ভেতরের কামরায় বসে কথা বলছিলেন শামস বখত ও সাদ বখত। বডিগার্ড এসে খবর দিল, 'কাজী সাহেব এসেছেন।'

মেয়েদের বসিয়ে রেখে দুই ভাই ড্রইং রুমে চলে এলেন কাজী সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য।

মধ্য বয়সী লোক কাজী আবুল ফজল ইবনুল খাশিব। হারান প্রদেশের প্রধান কাজী তিনি, গুমাস্তগীনের খুব প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। ওদের প্রবেশ করতে দেখেই কাজী সাহেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'শুনলাম হলব থেকে দূত এসেছে! সে নাকি খাসা উপহারও এনেছে?'

'হ্যাঁ!' সাদ বখত বললেন, 'কেল্লা প্রধান শুয়ে আছেন বলে দূতকে আমরা এখানেই বসিয়ে রেখেছি। উনি উঠলেই ওখানে পাঠিয়ে দেবো।'

'ভাল করেছো! আমি খলিফার পাঠানো উপহার দুটোই দেখতে এসেছি।' ইবনুল খাশিব চোখ টিপে বললেন, 'ওগুলো এক নজর দেখিয়ে দাও না আমায়।'

দুই ভাই কাজীর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে ভালই জানতো! গুমাস্তগীনের ওপর তার কি রকম প্রভাব তাও অজানা ছিল না ওদের। মেয়ে দু'টিকে না দেখালে সে যে ঝামেলা করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই ঝামেলা এড়াতে শামস বখত মেয়ে দু'জনকে তার সামনে এনে দেখালেন।

কাজী মেয়েগুলোকে যখন দেখলো তখন তার চোখে অবাক করা ঘোর লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'বাহ্‌বা, তোফা! তোফা! এত সুন্দরী!'

শামস বখত মেয়ে দু'টিকে আবার ভেতরের কামরায় পাঠিয়ে দিলেন। কাজী বললেন, 'এদেরকে আমার কাছে দিয়ে দাও। আমি নিজেই ওদেরকে গুমাস্তগীনের কাছে নিয়ে যাবো।' তার চোখে তখন শয়তান নাচছে।

'আপনি কাজী মানুষ!' শামস বখত বললেন, 'জাতির কাছে আপনার মর্যাদা গুমাস্তগীনের চেয়েও উর্ধে। আপনার হাতে রয়েছে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। একি বলছেন আপনি!'

'তুমি তো এক সামরিক বোকা পাঠা।' কাজী সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'তুমি নগর জীবনের স্বাদ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, আনাড়ী! এসব তুমি বুঝবে না। সেই কাজী বা বিচারক মরে গেছে, যাদের হাতে আল্লাহর আইন, ইনসাফ ও ন্যায়দণ্ড ছিল। তারা শাসককে ভয় করতো না, ভয় করতো শুধু আল্লাহকে। বরং শাসকগোষ্ঠীই ভয় পেতো কাজীদের, কখন জনসাধারণের ওপর অন্যায়-অবিচারের জন্য তাদের ধরে বসে!

এখন শাসকরা তাকেই কাজী বানায়, যারা সরকারের অন্যায়-অবিচারকেও জায়েয বলে ঘোষণা দিতে পারে। আইনকে নয়, শাসককে খুশী রাখাই এখন কাজীদের কাজ। ভুলে যাচ্ছো কেন, আমি আল্লাহর মনোনীত কাজী নই, আমি কাজী হয়েছি আমার শাসক সম্মানিত গুমাস্তগীনের ইচ্ছায়।'

'এ জন্যই তো তোমাদের মন মগজে এখন কুফরী বাসা বেঁধে আছে।' সাদ বখত বললেন, 'তোমার আর দোষ কি, শাসকই যেখানে ঈমান বিক্রি করে বসে আছে সেখানে তার কাজী তো ঈমান নিলামে তুলবেই! তোমার মত কাজীও আজ রাসূলের উম্মত, এটাই জাতির দুর্ভাগ্য। তোমাদের মত কাজীদের প্রশ্রয় পেয়েই আমাদের শাসক ও আমীররা আজ মেয়েদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার পায়।'
তিনি আরো বললেন, 'এ মেয়েরা তোমার মতই কোন মুসলমান ঘরের কন্যা! নিজের কন্যাদের সাথে কেউ অশালীন ব্যবহার করে!'
সেনাপতি শামস বখত যত গুরুত্ব দিয়েই কথাগুলো বলুক না কেন, কাজীর মনে তা কোন রেখাপাত করলো না। কাজী তার কথাকে হাসি ঠাট্টা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলো।
শয়তান তাকে এতদূর অগ্রসর করে দিল যে, সে সেনাপতিকে তিরষ্কার করতেও ছাড়লো না। হেসে বললো, 'হিন্দুস্তানী মুসলমানরা যে এত নিরস জানতাম না। তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে মরতে এলে কেন?'
কাজীর এ তিরস্কারে সত্যি সত্যি আহত হলেন শামস বখত। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'শোন কাজী! আমাকে তিরস্কার করো আর যা-ই করো, আমার কথাগুলো একটু মন লাগিয়ে শোনো! আমি তোমাকে শুধু এ জন্যই সম্মান করছি, তুমি একজন বিচারক। কিন্তু ভুলে যেওনা, তুমি আমার অধীনস্ত একজন কমাণ্ডার মাত্র ছিলে! এই তো তোমার পরিচয়!

শুধু তোষামোদ ও চাটুকারিতার জোরে তুমি এই পদে উন্নীত হয়েছো। আমি তোমার সম্মানকে অক্ষুন্ন রেখেই বলছি, আমরা কেন হিন্দুস্থান থেকে এসেছি তা শুনে নাও।

ছয়শ বছর আগে মুহাম্মদ বিন কাশিম নামে এক যুবক তার এক মুসলিম বোনের আর্ত চিৎকার শুনে সুদূর আরব থেকে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। নারীর ইজ্জত ও সতীত্বকে মুসলমান কতটা গুরুত্ব দেয় সেই যুবকের আবেগের দিকে তাকালে তা তুমি বুঝতে পারতে!

তুমি কি জানো, ভারতবর্ষ এখান থেকে কত দূরে ও কোথায়? তুমি অনুমান করতে পারো, ঐ যুবক কেমন করে তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে ছিলো?

তুমি তো নিজেও একজন সৈনিক ছিলে! চিন্তা করতে পারো, কেন্দ্র থেকে এত দূরে, কোন রকম সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার যেখানে কোন সুযোগ নেই, খাদ্য ও রসদের কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে কোন্ প্রেরণা ও শক্তি বলে তিনি সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন? শুধু ছুটেই যাননি, যুদ্ধ করে সেখানে বিজয় লাভ করেছিলেন?

স্থূল কামনা বাসনা ত্যাগ করে এর প্রকৃত রহস্যটা একটু বুঝতে চেষ্টা করো!

তিনি এমন সব অসুবিধা ও বাঁধা অতিক্রম করে বিজয় লাভ করেছিলেন, যেখানে বিজয়ের কথা চিন্তাই করা যায় না! তিনি

শুধু বিজয় লাভই করেননি, তিনি ভারতবাসীর মনও জয় করেছিলেন। আর কোন প্রকার অত্যাচার ও আগ্রাসন ছাড়াই সেই কুফরিস্তানে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।'

আমরা কেন এখানে এসেছি এবার সেই কথা বলি।

যিনি এক বোনের সম্ভ্রম বাঁচাতে ও ইসলামের আলো জ্বালাতে হিন্দুস্তান গিয়েছিলেন আল্লাহর সেই মুজাহিদদের মৃত্যুর পর এলো তাদের উত্তরসূরীদের যুগ। ধীরে ধীরে তাদের ঈমানী চেতনায় ঘুণ ধরলো। মানবতা ও সভ্যতার বাহকরা হয়ে পড়লো অলস ও বিলাসপ্রিয়। এমন লোকরা ক্ষমতায় চলে এলো, যারা মুসলিম নামধারী কিন্তু ইসলামের অনুসারী নয়। স্বার্থান্ধ বাদশাহদের হাতে ভূলুণ্ঠিত হলো মুজাহিদদের আদর্শ। ইসলাম সীমিত হয়ে পড়লো মানুষের ব্যক্তিগত আচার আচরণে। আবার অন্যায় ও অবিচার চেপে বসলো মানুষের কাঁধে। মানবতা হলো বিপর্যস্ত।

ক্রমে আরো অবনতি ঘটলো সেখানকার। হিন্দু রাজারা অথর্ব মুসলমান শাসকদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলো, যেমন এখানে খৃস্টানরা মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

ইসলামী শাসনের বিলোপ ঘটলো। মুসলিম সাম্রাজ্য ক্রমশ: দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগলো।

যখন আমরা যুবক হলাম, সেখানকার মুসলিম শাসনের অবস্থা দেখে দুঃখ ও হতাশায় ছেয়ে গেল আমাদের মন। মুহাম্মদ বিন কাশিম ও তার সাথীদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী

রাষ্ট্র থেকে ইসলাম বিতাড়িত। বিশ্ব ইসলামী খেলাফতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা শুধু আরবের কেন্দ্রীয় শাসন মুক্তই নয়, ইসলামের সামাজিক ন্যায়নীতি থেকেও মুক্ত হয়ে গেল।

সামাজিক সুবিচার ও শান্তি থেকে বঞ্চিত মানুষের আত্মার ক্রন্দন আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

আমরা যোদ্ধা বংশের সন্তান। এসব অনাচার ও অশান্তি যখন আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো, মুহাম্মদ বিন কাশিমের মত আরেকজন সেনাপতির সন্ধানে আমরা দুই ভাই দেশ ছাড়লাম।

আমরা হিন্দুস্তানের সেই নির্যাতীত মুসলমানদের দূত, যারা ব্যাকুল চিত্তে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছে কাশিমের মত এক ত্রাণকর্তার।

আরবের সাথে ভারতের মুসলমানদের যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, ভ্রাতৃত্বের দাবী নিয়ে আবার তা জোড়া দিতে এসেছি আমরা।

আমরা যখন সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর সাথে দেখা করলাম, তিনি বললেন, 'এখন আমি হিন্দুস্তানের দিকে কেমন করে অগ্রসর হই? তাকিয়ে দেখো, আরবের ভূমি ভরে গেছে বিশ্বাসঘাতক ও গাদ্দারে। কয়েকটা দিন সবুর করো, এসো এই আরবকে গাদ্দার মুক্ত করে সাচ্চা মুজাহিদদের হাতে তুলে দেই এর শাসনভার। তারপর তোমাদের নিয়ে আমি ছুটে যাবো ভারতের সেই মজলুম ভাইদের পাশে।'

কিন্তু আরবে এত বেশী গাদ্দার তৈরী হয়ে গেছে আমাদের জানা ছিল না। নূরুদ্দিন জঙ্গী এক সেক্টরে দুশমনকে পরাজিত করতে না করতেই আরো পাঁচ জায়গায় বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠে। গাদ্দারদের মোকাবেলা করতে গেলে আঘাত হানে কাফের খৃস্টানরা। খৃস্টানদের মোকাবেলা শুরু করলে মাথা তুলে দাঁড়ায় গাদ্দাররা।

এই করে করেই তিনি নিঃশেষ হয়ে গেলেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো খৃস্টানরা। তাদের মোকাবেলায় জেহাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

এসব দেখে শুনে আমাদের আফসোস ও দীর্ঘশ্বাস আরো দীর্ঘ হলো। ভারতের ভূখণ্ডে মুসলমানদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে হিন্দুরা, আর এ ভূখণ্ডে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে খৃস্টানরা।

মরহুম জঙ্গী আমাদেরকে তাঁর সামরিক বিভাগে ঠাঁই দিয়েছিলেন। যখন গুমাস্তগীন, সাইফুদ্দিন ও আজিম উদ্দিনরা গোপনে খৃস্টানদের সাথে আঁতাত করলো, তখন সুলতান জঙ্গী আমাদের দু'ভাইকে গুমাস্তগীনের সৈন্য বিভাগে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, আমরা যেন তার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখি। সে গোপনে কি করে, কাদের সাথে যোগাযোগ রাখে এসব দেখার জন্যই আমরা এখানে আছি।

নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে আমরা কেন এখানে এসেছি এ প্রশ্নের জবাব পেয়েছো তুমি?'

'অর্থাৎ তোমরা দুই ভাই এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে

এসেছো?' কাজী ইবনুল খাশিবের কণ্ঠ থেকে ব্যঙ্গাত্মক সুর ভেসে এলো।

'কাজী! আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করো।' শামস বখত ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো, আমাদের মুসলমান আমীররা সেই বীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যারা খৃস্টানদের নাগপাশ থেকে মুসলমানদের মুক্ত ও রক্ষা করতে চায়। আজকের দূত মারাত্মক সংবাদ বহন করে এনেছে।'

তিনি চিঠির সারমর্ম তাকে শুনিয়ে বললেন, 'গুমাস্তগীনের ওপর তোমার প্রভাব রয়েছে, তুমি তাকে বাঁধা দিতে পারো।

তুমি যদি আমার সাথে একমত হও, তবে এসো, আমরা গুমাস্তগীনকে বুঝাই, তাকে আমাদের মতে ফিরিয়ে আনি। এসো, গাদ্দারদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেয়ে সুলতান আইয়ুবীর সাথে মিলে যাওয়ার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করি।

তা না হলে তাকে এমন পরাজয় বরণ করতে হবে, যার বেদনা তাকে সারা জীবন ভোগ করতে হবে। এমনও হতে পারে, তাকে সারা জীবন কারাগারে বন্দী জীবন কাটাতে হবে। এখনও চিন্তা করার সময় আছে।'

'তার আগে আমি তোমাদের দুই ভাইকে সারা জীবনের মত কারারুদ্ধ করবো।' কাজী ইবনুল খাশিব বললো, 'মেয়ে দুটিকে আমার কাছে দিয়ে দাও।'

কাজী সেই কামরার দিকে পা বাড়ালো, যেখানে মেয়ে দু'টি বসে ছিল। সাদ বখত তার পথ আগলে দাঁড়ালো। সে সাদ

বখতকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে ক্ষীপ্ত সাদ বখত রাগে তার মুখে জোরে এক ঘুঁষি মারলো। প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে উল্টে পড়ে গেল কাজী ইবনুল খাশিব।

শামস বখত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তার একটি পা কাজীর গলার উপরে চেপে ধরলেন। কাজী কিছুক্ষণ ছটফট করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মারা গেল কাজী।

কাজীকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল না এ দুই ভাইয়ের। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাই ঘটে গেল।

দুই ভাই চিন্তা করে দেখলো, এখন গ্রেফতার হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের।

শামস বখত তার দুই অফিসারকে ডাকলেন। একজনকে বললেন, 'জলদি চারটি ঘোড়া প্রস্তুত করো।'

অন্য জনকে বললেন, 'ঘোড়া প্রস্তুত হলে মেয়েদেরকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিও।'

তিনি দ্রুত সাদ বখতের সাথে কিছু জরুরী আলাপ সারলেন। ততক্ষণে চারটি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে সেখানে হাজির করা হলো।

অন্য অফিসার মেয়েদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন শামস বখতের দরজায়।

ঘোড়া ও মেয়েদের প্রস্তুত দেখে দুই ভাই এগিয়ে গেলেন সেখানে। শামস বখত মেয়েদের বললেন, 'তোমাদের সাথে আর আলাপ করার সময় নেই। জলদি ঘোড়ায় চড়ে বসো। আমার লোক তোমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে।'

মেয়েরা পরিস্থিতির নাজুকতা বুঝতে পারল। তারা কথা না বাড়িয়ে দ্রুত গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো।
দু'জন বিশ্বস্ত কমাণ্ডোকে তীর-ধনুক ও তলোয়ার নিয়ে অপর দু'টি অশ্বে আরোহন করতে নির্দেশ দিলেন সেনাপতি শামস বখত। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করলো ওরা।
এরপর সেনাপতি শামস বখত ও তার ভাই সাদ বখত তাদের সাথে করে কেল্লার ফটক পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। সেনাপতির নির্দেশে প্রহরীরা কেল্লার ফটক খুলে দিল। পুরো দলটিকে নিয়ে তিনি কেল্লার বাইরে বেরিয়ে এলেন।
প্রহরীদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে এসে তিনি তাদের চারজনকে বিদায় জানালেন। দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে তাদের বললেন, 'তোমরা সোজা সুলতান আইয়ুবীর কাছে চলে যাবে। ওখানে পৌঁছে বলবে, আমি পাঠিয়েছি তোমাদের।'
গুমাস্তগীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতো কমাণ্ডোরা। চারটি ঘোড়া প্রাণপণে ছুটে চললো আর রিস্তানের দিকে।
সেনাপতি দু'জনেরও ওদের সাথেই পালিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু কি চিন্তা করে ওরা আবার দূর্গে ফিরে এলো।
গুমাস্তগীন ততক্ষণে জেগে উঠেছিল।
সেনাপতির মহল খালি থাকায় খলিফার দূত ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এলো গুমাস্তগীনের মহলে। মহলের প্রহরী গুমাস্তগীনকে খবর দিল, 'এক দূত আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

গুমাস্তগীন বললো, 'ঠিক আছে, তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'
দূত ভেতরে প্রবেশ করলে গুমাস্তগীন তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি? কোত্থেকে এসেছো?'
দূত তার পরিচয় দিয়ে বললো, 'আমি মহামান্য খলিফা আল মালেকুস সালেহের দরবার থেকে এসেছি।'
সে খলিফার চিঠির কথা বললো এবং সঙ্গে যে সব উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছে সেগুলোর কথাও বললো গুমাস্তগীনকে।
শামস বখত ও সাদ বখত ফিরে এসে গুমাস্তগীনের মহলে গেল। গুমাস্তগীন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়ে দুটি কোথায়?'
শামস বখত জবাব দিলেন, 'ওরা নিরাপদ স্থানে চলে গেছে।'
গুমাস্তগীন রক্ত চক্ষু মেলে ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'তার মানে?'
'তার মানে খুব সোজা। এ দুই মেয়ে ছিল মুসলিম পরিবারের সন্তান। আমি চাইনি, ওদের ইজ্জত নষ্ট হোক। তাই আমি ওদেরকে এমন স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি, যেখানে তাদের ইজ্জত-আবরু রক্ষা পাবে।'
গুমাস্তগীন রাগে তার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল।
দূত বললো, 'শুধু তাই নয়, এ দু'জন মিলে আপনার কাজীকেও খুন করে ফেলেছে!'
'হোয়াট?' রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গুমাস্তগীন তার প্রহরীদের ডাকলো। বললো, 'এদের পাকড়াও করো।'
দূতকে নিয়ে গুমাস্তগীন সেনাপতি শামস বখতের বাসায় গেলো। দেখলো, সত্যি, সেখানে কাজীর লাশ পড়ে আছে।

দূত পাশের কামরায় বসে সেনাপতিদের সাথে কাজী সাহেবের যে বাদানুবাদ ও আলোচনা শুনেছিল, সে সব কথা গুমাস্তগীনকে খুলে বললো।
গুমাস্তগীন সেনাপতি শামস বখত ও তার ভাই সাদ বখতকে সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন।
হারানের দূর্গ থেকে বের হয়ে চার অশ্বারোহী যখন প্রাণপণে ছুটছিল সুলতান আইয়ুবীর দিকে, সুলতান আইয়ুবী তখন হাসান বিন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'এখনও হারানের সেনাপতিদের কাছ থেকে কোন সংবাদ এলো না?'

সেনাপতি শামস বখত ও সেনাপতি সাদ বখতের সংবাদের জন্য সুলতান আইয়ুবী যখন পেরেশান, ওরা তখন কাজী ইবনুল খাশিবের হত্যা এবং আস সালেহের দরবার থেকে নিয়ে আসা দুই মেয়েকে দূর্গ থেকে বের করে দেয়ার অপরাধে কারাগারে বন্দী।
ঠিক সে সময় আস সালেহের আর একজন দূত মুসাল দূর্গের অধিপতি গাজী সাইফুদ্দিনের কাছে গিয়ে পৌছলো।
গাজী সাইফুদ্দিন খেলাফতের অধীনে মুসাল প্রদেশ ও তার আশপাশের এলাকার শাসক ছিলেন। কিন্তু নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে মুসালের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা দেন।
সাইফুদ্দিন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বংশের লোক হলেও তার বিরোধী ছিলো। সাইফুদ্দিন নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করায় মুসাল আর ইসলামী

সাম্রাজ্যের অংশ রইল না। নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তিনি সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জোটে যোগ দিয়েছিলেন।

তার ভাই আজিম উদ্দিন একজন দক্ষ ও পরীক্ষিত জেনারেল। সাইফুদ্দিনের সেনা বাহিনীর হেড অব্ দ্যা কমাণ্ড এই আজিম উদ্দিন।

অন্যান্য মুসলিম আমীরদের মতই সাইফুদ্দিনও ছিল ভোগ বিলাস প্রিয় এক শাসক। তার হেরেমেও ছিল দেশী বিদেশী সুন্দরী মেয়ের ছড়াছড়ি। ছিল নর্তকী ও গায়িকার দল।

এ ছাড়া তার ছিল পাখী পোষার এক অদ্ভুত শখ। অসংখ্য মেয়ের মত অসংখ্য পাখীতে ভরা ছিল তার মহল। রং-বেরংয়ের বিচিত্র পাখী খাঁচায় সাজিয়ে তাদের সাথে গল্প করতো সে। সুন্দরী নারী ও রং বেরংয়ের পাখী, দুটোই ছিল তার আনন্দ ও চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম।

আজিম উদ্দিনের সামরিক যোগ্যতা ও নৈপূণ্যের ওপর আস্থা ছিল তার। তার আশা ছিল, সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করে তার রাজ্য আরো বাড়িয়ে দিতে পারবে আজিম উদ্দিন।

এই আশায় সাইফুদ্দিনও হারান দূর্গের অধিপতি গুমাস্তগীন এবং তথাকথিত খলিফা আল মালেকুস সালেহের মত খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতো। খৃস্টানরা সাইফুদ্দিনকে আশ্বাস দিয়েছিলো, সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তারা তাকে সামরিক সাহায্য দিয়ে যাবে।

এভাবে সুলতান আইয়ুবীর অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে

পৌঁছলো, তার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরই তিনটি শক্তি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। হলবে আল মালেকুস সালেহ, হারানে গুমাস্তগীন ও মুসালে সাইফুদ্দিন।

এই তিনটি মুসলিম শক্তির কেউ কারো চেয়ে কম ছিল না, সামরিক বিচারে এদের কাউকে উপেক্ষা করার মতও ছিল না।

এ তিনটি বৃহৎ শক্তি ছাড়াও এদের প্রভাবাধীন ছোট ছোট শেখদের রাজ্য, মুসলিম নবাবদের পরগণার সংখ্যা ছিল অসংখ্য। এরাও সবাই এই তিন শক্তির সাথে ঐক্যজোটে থাকতে বাধ্য ছিল।

এ তিন শক্তির ইচ্ছে মত তারা সকলেই তাদেরকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল এবং অনেকেই প্রতিশ্রুত সাহায্য পৌঁছেও দিয়েছিল।

তাদেরকে বুঝানো হয়েছিল, সুলতান আইয়ুবী বিজয় লাভ করলে মিশর ও সিরিয়ার মত ছোট বড় সকল রাজ্যকে সে গ্রাস করে নেবে এবং তার অধীনস্ত ও গোলাম বানিয়ে রাখবে। এ ভয়েই ছোট ছোট রাজ্যগুলো ঐক্যজোটে শামিল হয়েছিল।

তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবাই একে অন্যকে ভয় করতো। স্বার্থের ঐক্য তাদের মানসিক দূরত্ব ঘুচাতে পারেনি। তারা কেউ চায়নি, অন্যেরা তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী হোক।

তাদের অবস্থা ছিল সেই পুকুরের মাছের মত, যেখানে ছোট

বড় সব মাছ একত্রে থাকে ঠিক, কিন্তু ছোট মাছগুলো সব সময় বড় মাছগুলোকে ভয় পায়। কোন্ সুযোগে কে তাকে গিলে ফেলে এই ভয়ে তটস্ত থাকে সব সময়। আর আশা করে, বেঁচে থাকলে সেও একদিন বিশাল মাছ হবে।

সুলতান আইয়ুবী তার ছড়িয়ে দেয়া গোয়েন্দাদের মাধ্যমে বিরোধীদের এ অনৈক্যের সব খবরই নিয়মিত পেয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলেন না বলে সব সময়ই এ সত্যও স্মরণে রাখতেন, তাঁর সামনে তিনটি বড় সামরিক শক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তারা আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা একা বা এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার বাহিনীর ওপর।

এ কথাও সব সময় মনে রাখতেন, এ তিনটি বাহিনীর সেনাপতি, কমাণ্ডার ও সৈন্যরা সবাই মুসলমান। তাদের সামরিক শিক্ষা, নৈপূণ্য ও বীরত্বও একই ধরনের। এ গুণগুলো ওরা মুসলমান বলেই পেয়েছে। এসব গুণ ও যোগ্যতা আল্লাহ অন্য কোন জাতিকে দেননি।

চার পাঁচ গুণ শক্তিশালী খৃস্টান বাহিনীকে এ মুসলিম বাহিনীর যে কোন দল পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে। সেই খৃস্টানরা যতই উন্নত সামরিক অস্ত্র, লৌহ বর্ম, শিরস্ত্রাণ ও তাজাদম ঘোড়াই ব্যবহার করুক না কেন, তাতেও তাদের পরাজিত হওয়ার কোন আশংকা নেই।

সুলতান আইয়ুবী হলব অবরোধ করে মর্মে মর্মে এ সত্য উপলব্ধি করেছেন। এটাই প্রথম ঘটনা, যেখানে মুসলিম সৈন্য

মুসলিম সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। হলব শহরের মুসলমান জনসাধারণ ও সৈন্যরা সেখানে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, শহরের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে যেভাবে জীবন উৎসর্গ করেছে, তার নজীর শুধু মুসলমানই দেখাতে পারে। এই বীরত্বের কথা সুলতান আইয়ুবী তার মন থেকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

সুলতান আইয়ুবীর কেবলি মনে পড়ছে, তিনি 'মুসলমান হয়ে মুসলমানদের ওপর অভিযান চালিয়েছেন', এই অপবাদের কথা। আব্বাসীয় খেলাফতের এক আমীর এ অপবাদ ছড়াচ্ছিল। তাকে মিশর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল খৃস্টানদের সাথে যোগসাজশের অভিযোগে। অথচ প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন রূপ।

সুলতান আইয়ুবী খৃস্টানদের কবল থেকে ফিলিস্তিন ও বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার অভিযানে বেরোলে খৃস্টানদের পদলেহী শাসকরা তার পথ আগলে দাঁড়ায়। ফলে তিনি বাধ্য হন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে। এ সত্য গোপন করে তার বিরুদ্ধে ইসলামী জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ অপবাদ ছড়াচ্ছিল দুশমন। ক্ষমতার লোভে অন্ধ শাসকরা এভাবেই চেষ্টা করছিল ইসলামী জনতাকে জেহাদের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে।

মুসলমানদের প্রথম কেবলা এখনো কাফেরের অধীন, সুলতান আইয়ুবী কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছিলেন না। জেরুজালেমকে শত্রুমুক্ত করার চিন্তা অহর্নিশ ঘুরপাক খেতো

তার মাথায়। তার প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে কাজ করতো এই চিন্তা।

এ চিন্তা কখনো তাকে এক জায়গায় শান্তিতে বসতে দেয়নি। পথের প্রতিটি বাঁধা সরিয়ে তিনি কেবল সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দুশমনের বাঁধা, গাদ্দারের গাদ্দারী তার পথ রোধ করতে পারেনি কখনো। তার প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে ছিল জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দুর্মর আকাঙ্খা।

ইহুদীদের পরিকল্পনাও তার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ভালমতই জানতেন, ইহুদীরা ধুরন্ধর ও অসম্ভব কূটকৌশলী। এমন ধুরন্ধর জাত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিলেন, কেন পবিত্র কোরআন একমাত্র ইহুদীদেরকেই মুসলমানের প্রকাশ্য শত্রু বলে ঘোষণা করেছে।

তারা কখনো সম্মুখ যুদ্ধে উপস্থিত হয় না। যুদ্ধের ময়দানে তারা লেলিয়ে দেয় মাথা মোটা খৃস্টানদেরকে। বিনিময়ে তাদের দেয় অঢেল আর্থিক সুবিধা।

এই সুবিধার পরিমাণ চিন্তা এবং কল্পনারও অতীত। এভাবেই খৃস্টানদের বন্ধুত্ব ক্রয় করে নিয়েছে ওরা। আর এই বন্ধুত্বের উসিলায় তাদের বিবেক এবং মাথাগুলোও তারা কিনে নিয়েছে।

খৃস্টানরা এখন বিশ্বময় দৃশ্যতঃ সবচে বেশী বিত্ত বেসাতের মালিক। ইহুদীরা তাদের শুধু এই সম্পদই দান করেনি, তাদের অসাধারণ সুন্দরী, রূপসী মেয়েদেরকেও তুলে দিয়েছে

ওদের হাতে।

এই মেয়েরা কেবল রূপে গুণেই অনন্যা নয়, ইহুদীদের জাতিগত কূটবুদ্ধি এবং চাতুর্যেও এরা অতুলনীয়া। খৃস্টানদের জাতিগতভাবে কব্জা করার পর এবার এসব মেয়েদের ওরা লেলিয়ে দিচ্ছে গাদ্দার মুসলিম আমীরদের পেছনে। নিজেরা না এসে ওদের পাঠাচ্ছে খৃস্টানদের মাধ্যমে। সেই সাথে সেই একই লোভ, সম্পদ ও ক্ষমতার প্রলোভন!

এ ষড়যন্ত্রের কথা যখনই মনে হয় তখনই সুলতান আইয়ুবী কাতর হয়ে পড়েন। খৃস্টানরা তাদের পেছনে ছায়ার মত লেগে আছে।

উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, দুর্ধর্ষ সেনা কমাণ্ডার, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজ্যের আমীর ওমরা, এমন কে নেই, যার পেছনে ওরা লাগেনি!

ওরা শত্রুর বেশে আসে না, আসে বন্ধুর বেশে। ফলে ওদের মোকাবেলা করা কত যে দূরূহ তা কেবল ভুক্তভোগীই জানে! কত ভাবে ও কত কায়দায় যে ওরা মুসলমানদেরকে মুসলমানের বিরুদ্ধে কাজে লাগায় তার কোন ইয়ত্তা নেই। যাদের টোপ গেলাতে পারে না, তাদের কাজে লাগায় একভাবে, যারা টোপ গেলে তাদের অন্য ভাবে।

মোট কথা, ওদের নজরে পড়লে কারো রেহাই নেই। আজ মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধের উস্কানী দিচ্ছে তাদেরই নিয়োজিত লোকজন। তাদেরই নীলনকশায় মুসলমানরা পরস্পরের বিরুদ্ধে তাক করেছে অস্ত্র।

এমন কঠিন সময়ে সব সময় চোখ-কান খোলা না রাখলে পতন অনিবার্য। সুলতান আইয়ুবী তাই তার বাহিনীকে সদা সতর্ক ও সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় রেখেছেন।

সামরিক বিভাগকে তিনি এমন ট্রেনিং দিয়েছেন এবং গোয়েন্দা সংস্থাকে এমন সচল রেখেছেন, দুশমনের যে কোন চাল ও পরিকল্পনার চাইতে যা সব সময় অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসু। ফলে শত্রুরা কোন ময়দানেই মুজাহিদদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

তারা তাদের মেধা, মনন, শ্রম ও যোগ্যতাকে এমনভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য লাভের হকদার হয়ে উঠেছিল তারা।

মুসাল প্রদেশে গিয়ে পৌছলো হলবের দূত। সঙ্গে তার সুলতান আল মালেকুস সালেহের চিঠি ও উপহার সামগ্রী।

এখানেও উপহার হিসাবে পাঠানো হয়েছে অন্যান্য সামগ্রীর সাথে হারানের মত দুই সুন্দরী মেয়েকে।

হারান কেল্লার অধিপতি গুমাস্তগীনের কাছে পাঠানো মেয়ে দুটিকে সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখত নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের পাঠাতে গিয়ে হত্যা করেছিলেন কাজী ইবনুল খাশিবকে। আর সেই অপরাধে নিজেরা বরণ করেছিলেন কারাগারের বন্দী জীবন।

কিন্তু মুসালের গভর্ণর সাইফুদ্দিন তার উপহার ও পয়গাম ঠিকমতই পেয়েছিলো। মেয়ে দুটি তাঁর অন্দর মহলের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তুললো।

হলবের দূত তাকেও সে রকম চিঠিই দিলো, যে রকম চিঠি গুমাস্তগীনকে দিয়েছিলো।
তাতে আরো উল্লেখ ছিল, 'খৃস্টানরা হলববাসীদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পূরণ করেনি। ওরা একবার যেহেতু ধোঁকা দিয়েছে, আবারও দিতে পারে। ফলে তাদের আশ্বাসের ওপর ভরসা করা যায় না। আবার চারদিকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন, তাদের বন্ধুত্ব সরাসরি অস্বীকার করাও এ মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।
তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার উত্তম পন্থা হলো, নিজেরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও ঐক্যবদ্ধভাবে সুলতান আইয়ুবীর ওপর আক্রমণ চালানো। সাফল্যের সম্ভাবনা দেখলে তারা যে তাদের দুয়ার খোলা রাখবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু রিস্ক নিয়ে তারা আমাদের বিজয়ী করতে আসবে না।
সুলতান আইয়ুবী এখন আর রিস্তান পর্বতের দুর্গম শৃঙ্গের ওপর তাবু টানিয়ে বসে আছেন। ভাল খেলোয়াড়ও খেলতে খেলতে এক সময় ভুল করে বসে। পাগল গাছের মাথায় চড়ে ভাবে, কেউ আর তার নাগাল পাবে না। আমাদের জন্য এ এক মহা সুযোগ! আমরা একসাথে তাঁকে আক্রমণ করলে আর খৃস্টানরা একটু সহায়তা করলে তাকে সহজেই পরাস্ত করা সম্ভব। আমি তো মনে করি, তার সাথে যুদ্ধ করারও প্রয়োজন হবে না, কেবল অবরোধ করে বসে থাকলে একদিন খাদ্যাভাবেই সে ধরাশায়ী হয়ে যাবে।'
এ চিঠিতেও উল্লেখ করা হয়েছে, 'সেখানে বরফ গলতে শুরু

করেছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, সুলতান আইয়ুবীর সামরিক শৃংখলা বরফ গলা পানির প্রবাহে তছনছ হয়ে গেছে। আমাদের ঐক্যজোটের তিন শরীক একত্রে সামরিক অভিযান চালালে, পাহাড়ী প্রান্তরেই সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত ও চিরতরে ধ্বংস করে দিতে পারবো।'

চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, 'গুমাস্তগীনকেও অনুরূপ চিঠি দেয়া হয়েছে। আশা করি আমাদের ঐক্যবদ্ধ সামরিক জোটকে কার্যকরী করতে আপনিও সচেষ্ট হবেন। সময় নষ্ট না করে আপনার সৈন্য বাহিনী ঐক্যজোটের কমাণ্ডে নিয়ে আসুন, যাতে সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করে আমরা আমাদের নিজ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি।'

সাইফুদ্দিন এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তার ভাই আজিম উদ্দিন, দু'জন সিনিয়ার জেনারেল এবং মুসালের সম্মানিত খতীব ইবনুল মাখদুম কাকবুরীকে ডেকে পাঠালেন।

সকলে সমবেত হলে তিনি খলিফার চিঠি সবার সামনে পুনরায় পাঠ করলেন। এরপর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা সকলেই জানেন, আমরা সুলতান আইয়ুবীর বিরোধী। তার আনুগত্য করার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই। আমার দেহের শিরায় যে রক্ত প্রবাহিত, তার দেহের শিরাতেও ঠিক একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এখন আপনারা বলুন, এ পত্রের আমি কি জবাব দেবো? আমরা কি সামরিক ঐক্যজোটে যোগ দেবো?'

'এ ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা কি?' জানতে চাইলেন খতীব

ইবনুল মাখদুম কাকবুরী।
'আমার ইচ্ছে, প্রকাশ্যে এই ঐক্যজোটে যোগ দেয়া। কিন্তু শর্ত থাকবে, যে এলাকা আমাদের সৈন্য দ্বারা বিজিত হবে সে এলাকা আমাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেখানে অন্য কেউ আধিপত্যের দাবী করতে পারবে না।'
এক সেনাপতি বললো, 'আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তারচে উত্তম আর কোন সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আমাদের সৈন্যরা যে এলাকা জয় করবে, সে এলাকার হকদার আপনি, এতে কারো কোন আপত্তির প্রশ্ন উঠতে পারে না।'
'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খৃস্টান ও সুদানীদের পরাজিত করতে পারলেও আমাকে পারবে না। কারণ আমাদের উভয়ের শরীরে একই রক্তধারা প্রবাহিত এবং আমি তার যুদ্ধ কৌশল ভাল করেই জানি।' বললো সাইফুদ্দিন।
অপর এক সেনাপতি বললো, 'আপনি আপনার সৈন্য বাহিনী ঐক্যবদ্ধ জোটে শামিল করে দিন কিন্তু সৈন্য পরিচালনার কমাণ্ড আপনার হাতেই রাখবেন। আপনি আপানর সৈন্য বাহিনীকে এমনভাবে পরিচালনা করবেন, যেন আমাদের সফলতা হলব ও হারানের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে।'
'শাহানশাহে মুসাল! আমি আপনার আদেশের ওপর জীবন কোরবানী করে দেবো।' প্রথম সেনাপতি বললো, 'আমরা আপনাকে এই মুসলিম সাম্রাজ্যের শাহানশাহ বানিয়ে দেবো, যে স্বপ্ন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী দেখছেন।'
'গাজী সালাহউদ্দিনের মাথা এনে আপনার পদতলে রেখে

দেবো।' বললো অপর সেনাপতি, 'তার সৈন্য বাহিনীকে আর রিস্তানের পাহাড়ী এলাকা থেকে বেরই হতে দেবো না। আপনি সত্বর যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিন। আমাদের সেনা বাহিনী যুদ্ধ যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে।'

দুই সেনাপতিই উচ্ছ্বাস ও আগ্রহে টইটম্বুর। কার চেয়ে কে বেশী তাবেদারী ও খোশামুদি করতে পারে তার যেন প্রতিযোগিতা চলছিল।

সেনাপতি আজিম উদ্দিন চুপচাপ বসে শুনছিলো ওদের বক্তব্য। খতীব ইবনুল মাখদুম কখনও সেনাপতিদের মুখের দিকে, আবার কখনো সাইফুদ্দিনের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন ওদের মনোভাব।

'আজিম উদ্দিন, তোমার কি ধারণা?' সাইফুদ্দিন তাঁর ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার এই সিদ্ধান্তে আমরা একমত, আমরা সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।' আজিম উদ্দিন বললো, 'কিন্তু আমাদের সেনাপতিদের এমন আবেগপ্রবণ কথা শোভা পায় না, যেমন আমাদের দুই সেনাপতি বলছেন। সুলতান আইয়ুবীকে এতটা হালকাভাবে দেখা কোন অভিজ্ঞ সেনাপতির কাজ নয়।

আমি বলছি না, সুলতান আইয়ুবীকে আমরা পরাজিত করতে পারবো না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, যিনি অল্প ক'জন সৈন্য নিয়ে খৃস্টানদের বহুগুণ সৈন্যের মোকাবেলা করে তাদের পরাজিত করেছেন, যিনি মরুভূমির সৈন্য নিয়ে

পাহাড়ের বরফ ঢাকা প্রান্তরে যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাজিত করতে পারেন, যিনি সম্রাট রিমাণ্ডের সৈন্য বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছেন, তিনি বরফ গলা পানি প্রবাহের মধ্যেও ভালমতই যুদ্ধ করতে পারবেন, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের আগেই খুশী হওয়ার কোন কারণ নেই। শত্রুকে কোন সময় দুর্বল ভাবতে হয় না। আপনি নিজেই চিন্তা করুন, যাঁর সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, তার সামরিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কেমন? চিন্তা করুন সেই যুদ্ধের ময়দানের কথা, যেখানে কেবল তার সৈন্যরাই যুদ্ধ করবে না, জিততে হলে আপনাকেও সেখানে যুদ্ধ করতে হবে। তার সৈন্যদের মোকাবেলায় আপনার সৈন্যরা সে ময়দানে যুদ্ধ করতে কত বেশী পারঙ্গম, সেটাও আপনাকে চিন্তা করতে হবে।'

এরপর আজিম উদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের যোগ্যতা ও গুণের প্রশংসা শুরু করলো। সুলতান আইয়ুবীর রণকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করলো বিজ্ঞ সেনাপতির মতো।

এরপর যে ময়দানে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে সে ময়দানের অবস্থার ওপর আলোকপাত করে বললো, 'বরফ গলতে শুরু করেছে এবং বসন্তের ঋতুতে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনাও আছে। এ বৎসর বৃষ্টি একটু দেরীতেই হচ্ছে।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যরা এখনও তাবুতেই আছে। কিন্তু ঘোড়া তো আর তাবুর মধ্যে নেই। এ সময় তাদের সামরিক অশ্বগুলো নিশ্চয়ই পর্বতের গুহায় ও গাছের

নিচে আছে। উট ও ঘোড়া এ অবস্থায় বেশীক্ষণ সবল ও সুস্থ থাকে না।

আমরা এ আশাও করতে পারি, আইয়ুবীর সৈন্যরা পাহাড়ী অঞ্চলের ভয়ংকর শীতে থাকতে থাকতে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে। আবার এ কথাও খেয়াল রাখতে হবে, যদি আমাদের সৈন্য হলব ও হারানের সৈন্যদের সাথে মিশিয়ে ফেলি, তবে সুলতান আইয়ুবী আমাদের সকলকে অবরোধ করে ফেলতে পারে।

বিশেষ করে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার, মুসলমান সৈন্যরা যখন অন্য মুসলিম বাহিনীর সামনা-সামনি হবে, তখন এমনও হতে পারে, তারা পরস্পর যুদ্ধ করার পরিবর্তে আপোষে মিলেও যেতে পারে।

তারা একে অপরের বিরুদ্ধে তলোয়ার উন্মুক্ত করবে, কিন্তু সেই তলোয়ার সহসাই আবার কোষবদ্ধও হয়ে যেতে পারে। রক্ত প্রবাহের পরিবর্তে একে অন্যের সাথে মেতে উঠতে পারে কোলাকুলিতে।'

'আজিম উদ্দিন!' সাইফুদ্দিন তার কথার মাঝখানে বলে উঠলেন, 'তুমি একজন সৈনিক! তুমি শুধু রক্ত, তীর ও তলোয়ারের চমক সম্পর্কেই চিন্তা করতে পারো, বাকী খবর আমার কাছ থেকে শুনে নাও। যুদ্ধের চাল আমরাও কম জানি না।

মুসলমান সৈনিককে কেমন করে মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানো যায় শিখে নাও আমার কাছ থেকে।

আর মাত্র দু'দিন পর রমজান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যেমন নামাজ রোজার অনুসারী ও পাবন্দ, তার সৈনিকরাও তেমনি নামাজ রোজার পাবন্দ ও অনুসারী। তার সৈন্যরা যুদ্ধের অবস্থায়ও রোজা রাখবে। ফলে তারা হবে খুবই ক্লান্ত ও দুর্বল।

আমি আমার সৈন্যদের ফতোয়া দিয়ে দেবো, যুদ্ধের ময়দানে রোজা রাখা ফরজ নয়। আমাদের মাননীয় খতীব সাহেব তো সামনেই আছেন, আমি তাঁকে দিয়েই এ ঘোষণা প্রচার করাবো, যুদ্ধের সময় রোজা মাফ আছে!

আমরা দুপুরের পর থেকে আক্রমণ আরম্ভ করবো। কারণ সকালে তার সৈন্য বাহিনী তরতাজা থাকবে। কিন্তু দুপুরের পরে তারা হয়ে পড়বে ক্ষুধায় কাতর।

আমাদের সৈন্যরা খেয়ে দেয়ে তরতাজা হয়ে যখন যুদ্ধে নামবে, তখন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ক্ষুধা-পিপাসায় ক্লান্ত সৈন্যদেরকে সহজেই পরাস্ত করতে পারবে।

আপনারা সবাই যুদ্ধের সপক্ষে রায় দিয়েছেন। এখন আমি ঘোষণা করতে চাই, আপনাদের সকলের পরামর্শের আলোকে আমি যে পরিকল্পনা আপনাদের শুনিয়েছি, আমার সে প্ল্যানই তাহলে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে। আমরা সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এবং অচিরেই আমরা যুদ্ধ যাত্রায় এ শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবো।'

'আপনার এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক।' একজন সেনাপতি বললো।

'আপনার এই প্ল্যান কার্যকরী করে প্রমাণ করবো, আপনি সঠিক।' অপর সেনাপতি বললো।

'আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি বিলিনি।' আজিম উদ্দিন বললো, 'আর একটি পরামর্শ দেবো, আপনি নিজেকে সব সময় নিরাপদ অবস্থানে রাখবেন। যদি প্রয়োজন হয়, তবে আপনি সামনে যাবেন। প্রথম আক্রমণের ঝুঁকি আমাদের হাতেই থাকবে।'

'হ্যাঁ, তাই হবে!' সাইফুদ্দিন বললো, 'সৈন্য বাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করে নাও। আর জলদি অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে বলে দাও। সম্মুখ বাহিনী থাকবে তোমার কমাণ্ডে, আর রিজার্ভ বাহিনীর সৈন্যদেরকে আমার কমাণ্ডেই রেখে দেয়া হবে।'

খতীব ইবনে মাখদুম-এর দিকে তাকিয়ে সাইফুদ্দিন হেসে বললেন, 'সম্মানিত খতীব, আপনি এস্তেখারা করে কয়েকবারই বিপদ থেকে আমাকে সতর্ক করেছেন। আপনি আমার সফলতা ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়াও করেছেন। আপনি জানেন আপনার চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি আমি আর কাউকে জানি না। যদি কোন লোকের কাছে মাথা নত করতে হয়, সে ব্যক্তি আপনি।

এখন আমি এমন এক অভিযানে যাচ্ছি যার সফলতা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত! আমি এমন এক শক্তিশালী শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে যাচ্ছি, খৃস্টানের মত বিশাল শক্তিও যার সাথে টক্কর দিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেছে। এখন

আপনিই আমার ভরসা। আবার একটু এস্তেখারা করে দেখুন, আমার ভাগ্যে বিজয়ের সম্ভাবনা কতটুকু!'

'সম্মানিত আমীর!' খতীব বললেন, 'এ কথা অবশ্যই সত্য, আপনি কয়েকবার আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর সময় একবার এক সশস্ত্র ডাকাত দলের পিছু ধাওয়া করেছিলেন আপনি। তখন আমি আপনাকে আপনার সফলতার সুসংবাদ শুনিয়েছিলাম এবং আপনি সফলতা লাভ করেই ফিরে এসেছিলেন।

খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যখন আপনি অভিযান চালিয়েছিলেন, আমি আপনার বিপদ ও কামিয়াবী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলাম। আল্লাহর হাজার শুকুর, আমার প্রতিটি ইঙ্গিত অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু....'

খতীব প্রথমে আজিম উদ্দিন ও পরে দুই সেনাপতির দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন, 'হে মুসালের আমীর! আমি এস্তেখারা ছাড়াই আপনাকে বলে দিতে চাই, আপনি যে লক্ষ্যস্থলে আপনার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে যাচ্ছেন, সেখানে আপনি সফল হবেন, কি ব্যর্থ হবেন, আপনি কি সত্যি সে ব্যাপারে আমার মতামত চান?'

'হ্যাঁ! জলদি বলুন সম্মানিত খতীব!' সাইফুদ্দিন অধীর হয়ে বললেন।

'আপনি এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবেন, যদি সুযোগ মত পলায়ন না করেন, তবে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবেন।' খতীব বললেন, 'যদি আমার পরামর্শ আপনি সত্যি শুনতে চান,

তাহলে আমি আপনাকে এ পরামর্শই দেবো, আপনি সে রণাঙ্গণে নিজেও যাবেন না, আপনার বাহিনীও পাঠাবেন না। আমি এই সতর্কবাণী আপনাকে জানিয়ে দিলাম।'

সাইফুদ্দিনের চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভয় ও আতংক খেলা করতে লাগলো সে চেহারায়।

আজিম উদ্দিন ও সেনাপতিরা নীরব। খতীব গভীর দৃষ্টিতে দেখছিলেন সাইফুদ্দিনকে।

'আপনি তো এস্তেখারা করেননি!' সাইফুদ্দিন বললেন, 'তাহলে আপনি কেমন করে এমন মন্তব্য করলেন? আর আমি কেনই বা আপনার এ অশুভ ইঙ্গিত সত্য বলে মেনে নেব?'

'শুনুন মুসালের আমীর!' খতীব ইবনুল মাখদুম বললেন, 'আমি আপনাকে যতবার সতর্ক ও সুসংবাদ দান করেছি তার সঙ্গে এস্তেখারার কোন সম্পর্ক ছিল না।

কোরআন কোন যাদুকরের লেখা কিতাব নয়। কোরআন হাদীস পড়ে আল্লাহর কুদরতের যে রহস্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং আল্লাহর দেয়া জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আমি যা বুঝেছিলাম, তাই শুধু বলেছিলাম আপনাকে। কোরআনে আল্লাহ্ জয়-পরাজয়ের কিছু সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণা মিথ্যা হতে পারে না। যে কোরআনের নির্দেশ মত চলবে সে সফল হবে, আর যে কোরআনের নির্দেশ অমান্য করবে সে ব্যর্থ হবে।

আপনাকে দেয়া প্রতিটি পরামর্শই ছিল কোরআনের সেই জ্ঞানের আলোকে। তখন আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল

আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। কিন্তু বর্তমানে যে দিকে আপনি অগ্রসর হচ্ছেন তা আল্লাহর নির্দেশের সম্পূর্ণ বিপরীত।'
'আপনি কেমন করে বলতে পারেন, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রাসূলের (সা.) আদর্শ ও সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত?' সাইফুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে বললো, 'আমি বলছি তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আমি তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেবো না। মৃত্যুই তাকে আর রিস্তানে টেনে এনেছে। আমি তাকে শেষ করে পরে খৃস্টান সহযোগীদের মুখোমুখী হবো।'
'আপনি কথার যাদু দিয়ে যতই আমাদের ধোঁকা দিতে চান, আল্লাহকে তো আর ধোঁকা দিতে পারবেন না।' খতীব বললেন, 'আল্লাহ সমস্ত গোপন খবর জানেন, যে সব মতলব আমরা নিজেদের অন্তরে গোপন রেখেছি, তাও জানেন! বিজয় ও সফলতা তারই হাতে। যে তার নফসকে পরাজিত করতে পেরেছে, কেবল সেই আল্লাহর সাহায্য আশা করতে পারে।
আমি আবারো ভবিষ্যতবাণী করছি, পরাজয় আপনার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে। যদি আপনি আল্লাহর সত্য পথের সৈনিক ও যোদ্ধা হন আর জেহাদের জন্য বের হতে পারেন, তবে আপনার ভাগ্যের এ লেখা পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু ইসলামের পতাকাবাহী কাফেলার মোকাবেলায় এগিয়ে গেলে আপনার পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না।'
'সম্মানিত খতীব, আপনি আপনার বক্তব্য মসজিদের মধ্যে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ রাখুন। যুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় পলিসি

কখনোই আপনার বুঝে আসবে না। আপনি এমন বক্তব্য দিয়ে আমাদের আবেগ ও প্রেরণাকে নষ্ট করার চেষ্টা করবেন না।
যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করতে হলে যা অর্জন করতে হয়, তার সবই আমরা অর্জন করেছি। যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ উপকরণ ও সরঞ্জামে সাজিয়েছি আমাদের বাহিনী। পরাজিত হওয়ার কোন ট্রেনিং পায়নি আমাদের সৈনিকরা, ওরা শুধু বিজয় ছিনিয়ে আনারই প্রশিক্ষণ পেয়েছে।'
খতীবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বললো আজিম উদ্দিন।
'যদি আপনি রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করতে চান, তবে রাজনীতিতে সত্য বলে কিছু থাকবে না। ঈমানী জযবা বলে কিছু থাকবে না। মুসলমান অস্ত্র ও সামরিক শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে না, তারা জেহাদ করে ঈমানের বলে। আর এ ঈমানী চেতনা মানুষকে দান করে তার ধর্ম।
যেখানে ধর্ম নেই সেখানে বাস করে অধর্ম। রাজনীতি ও ধর্ম আলাদা হয়ে গেলে রাজনীতিতে অধর্মের চর্চা শুরু হয়ে যাবে। হয় তোমাকে ধর্মের পক্ষ নিতে হবে, নয়তো অধর্মের, মাঝামাঝি কোন পথ নেই। একটি মুদ্রার দুটিই পিঠ থাকে, কোন কথা সত্য না হলে মিথ্যা হবে, কোন কাজ ন্যায় না হলে অন্যায় হবে। পক্ষ তোমাকে একটি নিতেই হবে, এখানে নিরপেক্ষতার কোন অবকাশ নেই।'
'তত্ত্বকথা হিসাবে এ মন্দ নয়, কিন্তু যুদ্ধে কেবল কথার জোরে জেতা যায় না, সেখানে দরকার হয় শক্তি, ক্ষমতা ও

কৌশলের। ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয়।' বললেন সাইফুদ্দিন।

খতীব বললেন, 'আপনি সত্যিই বলেছেন, যুদ্ধের ব্যাপার আমার কোন প্রশিক্ষণ নেই, এসব ব্যাপার আমি বুঝতেও পারি না। কিন্তু কোরআন, হাদিস ও ইতিহাস পড়ে এ কথা খুব ভাল করেই বুঝেছি, কখন মানুষ পরাজয় বরণ করে?

আমার কথা আপনাদের খারাপ লাগতে পারে। সাধারণভাবে সব কালেই আমার মত হিতৈষীদের কথাকে উড়িয়ে দিয়েছে তৎকালীন শাসকবর্গ। কিন্তু মনে রাখবেন, নেতারা যখন তোষামোদ প্রিয় হয়, নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের আন্তরিকতার চেয়ে লোভী চাটুকাররা যখন নেতার কাছে বেশী প্রিয় হয়ে যায়, তখন তাদের পতন কেউ ঠেকাতে পারে না।

আমি আমার বিবেক বিসর্জন দিয়ে আপনাদের উচ্চাশায় বাহবা দিলে নিশ্চয়ই আপনারা খুশী হতেন। কিন্তু এটা আমার আপনার ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন নয়, এর সাথে জড়িত জাতির মান-সম্ভ্রম ও অস্তিত্ব। এ সময় হটকারী সিদ্ধান্ত নিলে নিজেরাও ডুববেন, আর জাতিকেও ডুবাবেন।'

আলোচনা এ পর্যায়ে এসে বেশ তিক্ত হয়ে উঠল। সেনাপতিরা এর কোন প্রতিবাদ না করলেও রাগে ফুঁসছিল।

সাইফুদ্দিনের কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্ট। আজিম উদ্দিন মাথা নিচু করে গভীরভাবে চিন্তা করছিল। খতীব থামলে সে বললো, 'আপনি হঠাৎ করে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কেন বুঝলাম না?'

'উত্তেজিত হওয়ার নিশ্চয়ই কারণ আছে। তোষামোদকারী ও গোলাম শ্রেণীর লোকের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হলে জাতির চিন্তা তাদের মাথায় থাকে না। তাদের সব সময় চিন্তা থাকে একটাই, কি করলে নেতা খুশী হবে? ফলে তোষামোদকারী সেনাপতি তার অধীনস্তদেরকে তোষামোদী শেখায়। তারা শেখায় তাদের অধীনস্তদের। শেষ পর্যন্ত সেই সামরিক বাহিনী দেশ ও জাতির জন্য যুদ্ধ করার পরিবর্তে শাসকশ্রেণীকে খুশী করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।'

সাইফুদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'আমি আপনার দরবারেও লক্ষ্য করেছি, দু'জন সেনাপতি আপনার সুরে সুর মিলিয়ে এমন চাটুকারী ভাষায় কথা বললো, যে চাটুকারীতা কোন সৈনিকের মুখে শোভা পায় না। আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, তারা শুধু আপনার প্ল্যানের তারিফ ও গুণগান করেই শেষ করলো, কিন্তু এ অভিযানের অসুবিধার বিষয় নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করলো না। কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা তাও বললো না।

খৃস্টানরা আজ মুসলমানদের গ্রাস করার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। মসজিদুল আকসায় আজ কাফেরের আধিপত্য। এই অবস্থায় আপনি, গুমাস্তগীন ও হলবের শাসক সকলেরই উচিত সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে এক জোট হয়ে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান চালানো।

আপনি যদি ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতেন তবে ইসলামের দুশমনরা আপনার বিরুদ্ধে চলে যেতো। কিন্তু

খৃস্টানরা আপনার পরিবর্তে সালাহউদ্দিনকে টার্গেট করেছে, এতেই প্রমাণিত হয় সে সত্যিকার অর্থেই রাসূলের (সা.) আদর্শের ওপর অটল আছে। সে একজন রাজ্যলিপ্সু ব্যক্তি, এটা দুশমনেরই অপপ্রচার।

আপনার সেনাপতিরা আপনাকে এমন কোন পরামর্শই দেয়নি, যা আপনার সাহায্যে আসবে। তারা আপনাকে এ কথাও বলেনি, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী শুধু আর রিস্তানের পার্বত্য এলাকায় ঘাঁটি করেই বসে নেই, তার বিভিন্ন দলের সেনা কমাণ্ডো, গোয়েন্দা ও রিজার্ভ বাহিনী চারদিকের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদেরকে অবরুদ্ধ করতে গেলে সেখানে আপনাদেরই অবরোধের আওতায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

আপনি তার কমাণ্ডো বাহিনীর ক্ষিপ্রতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে ভালমতই জানেন। আইয়ুবীর গোয়েন্দা বাহিনী কি পরিমাণ চৌকস তাও আপনার অজানা নয়। তারা আপনার শুধু গতিবিধির খবরই রাখে না, আপনার মনের খবরও তারা বের করে নিতে পারে।

আপনি এখান থেকে বের হয়ে আপনার এলাকা ত্যাগ করার আগেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে আপনার সৈন্য সংখ্যা, সৈন্যদের গতিবিধি ও গমনের রাস্তার পুরো নক্সা পৌঁছে যাবে।'

'সুলতানে মুসাল!' এক সেনাপতি রাগান্বিত হয়ে বললো, 'আমরা কি আপনার দরবারে এসেছি এই অপমান সহ্য করার জন্য? মসজিদে বসে রাত দিন আল্লাহ্ আল্লাহ্ করা ছেড়ে এই

লোক আমাদের যুদ্ধ শেখানোর দু:সাহস দেখাচ্ছে?
এই খতীব আপনার প্ল্যান ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আমাদের সামনে আপনাকে অপমান করবে, এটা আমরা কিছুতেই বরদাশত করতে পারি না।'
'আমাকে তার কথা শুনতে দাও।' সাইফুদ্দিন বললেন, 'আমি সম্মানিত খতীবকে এখনও সম্মানের চোখেই দেখছি।'
'বলে যান সম্মানিত খতীব!' আজিম উদ্দিন ব্যঙ্গ করে বললো, 'তারপরে আপনাকে এ কথাও বলতে হবে, আপনার আনুগত্য কার প্রতি? আমাদের, না সালাহউদ্দিনের প্রতি?'
'আমার আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রতি!' খতীব আজিম উদ্দিনের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আমি আপনার প্রশংসা করছি, আপনি বরং আপনার ভাইকে বাস্তবতা ও সত্য অনুধাবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদিও এরপরই আপনিও আপনার চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন সত্য থেকে।
ইমাদুদ্দিনও আপনাদেরই ভাই। কখনও কি চিন্তা করেছেন, কেন তিনি সালাহউদ্দিনের সহযোগী হয়েছেন? কেন তিনি আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসেন না? অথচ তার তো আপনাদেরই সহযোগিতা করা উচিৎ ছিল।'
'আপনি আমাদের বংশ ও আত্মীয়তায় হস্তক্ষেপ করতে যাবেন না।' আজিম উদ্দিন বললো, 'আসলে আপনি আমাদের কাছে প্রমাণ করতে চান, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ! আমাদের সকলকেই তাঁর কাছ মাথা নত করতে হবে।

কিন্তু আপনার কাছে শুধু জানতে চাওয়া হয়েছিল, এস্তেখারা করে আপনি আমাদের মিশনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আপনার মতামত পেশ করবেন!'

'আমার মতামত তো আমি বলেই দিয়েছি।' খতীব বললেন, 'যদি আমার কথা আপনারা বুঝে না থাকেন, তবে আরো স্পষ্ট করে বলছি, শুনুন!

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আল্লাহ প্রেরিত কোন নবী বা রাসূল নন! তিনি বর্তমান যুগের এক তুফান! এক সাইক্লোন! মরুভূমির তিনি এক অশান্ত সাইমুম!

দামেশকের মাটি থেকে উত্থিত এ মরু ঝড় কুফরীর শুষ্ক ঘাস পাতাই শুধু উড়িয়ে নিয়ে নীল নদে ফেলবে না, মূলসহ কুফরীর সকল বৃক্ষই উপড়ে ফেলবে। গাছ থেকে সব ডালপালা, পত্র পল্লব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে নীল নদে।

সুলতান আইয়ুবী আপনাদের ওপর আক্রমণ করেননি। আপনারাই সেই ঝড়ের মুখে স্বেচ্ছায় ছুটে যেতে চাচ্ছেন! বুঝতে চেষ্টা করছেন না, ঝড় কাউকে রেহাই দেয় না। এ ঝড়ের কবলে পড়লে আপনাদেরও সেই দশাই হবে, যে পরিণতি হবে কুফরী শক্তির।'

'খতীব!' সাইফুদ্দিন গর্জন করে বললেন, 'আমার মন থেকে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান উঠিয়ে নিবেন না!'

'তুমি..... সাইফুদ্দিন!' খতীব তাঁর স্বর আরো বলিষ্ঠ করে উচ্চ কণ্ঠেই বললেন, 'তুমি এই পৃথিবীর ছোট্ট একটি অঞ্চলের

সামান্য এক শাসক! আমাকে সম্মান দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই, তুমি দোজাহানের সেই বাদশাহকে ভয় করো, যিনি তোমাকে এই ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

আমার কথায় মনে কষ্ট পেলে আমার মুখে থুতু নিক্ষেপ করো। তাতেও রাগ না কমলে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করো। কিন্তু রাসূলের (সা.) আদর্শ ও দ্বীন থেকে সরে যেও না।

রাজ্য ও ক্ষমতার লোভ তোমার ওপর চেপে বসেছে। এই স্বার্থপর চাটুকার সেনাপতি ও তোমার সরকারের বড় বড় অফিসাররা তোমাকে খুশী করার জন্য তোমাকে বাদশাহ বলে! কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না, এটা শুধু তোষামোদ ছাড়া আর কিছু নয়!

তোমার জানা উচিত, এই চাটুকাররা তোমার বন্ধু নয়। এরা তোমার শত্রু! দেশের শত্রু! জাতির শত্রু! যখন তোমার ক্ষমতা থাকবে না তখন এই তোষামোদী দল তোমাকে চিনবেও না। বরং তোমার স্থলে যে ক্ষমতায় আসবে, ওরা তারই পা চাটবে।

দেখো সাইফুদ্দিন, আমাকে ভুল বুঝো না, আমাকে তোমার শত্রু ভেবো না। ভুলের নৌকায় পা দিয়ে তোমার মহলকে দোজখ বানিয়ে নিও না।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও, অতীতে এ রকম ভক্ত চাটুকাররা বহু প্রতাপশালী বাদশাকে ফকির বানিয়ে দিয়েছে। অতীতে যেমন এ রকম ঘটনা ঘটেছে, হয়তো ভবিষ্যতেও ঘটবে।

আমার চিন্তা শুধু তোমাকে নিয়ে। তাদের খপ্পড়ে পড়ে তুমি ধ্বংস হয়ে যাও, এ আমি চাই না।

আফসোস! আজ রাসূলের (সা.) উম্মতরা এক ধ্বংসাত্মক পথে অগ্রসর হচ্ছে। তুমি ভুল করলে, তোমার মত বাদশাহকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে তবেই এ তুফান থামবে।'

'নিয়ে যাও একে আমার সম্মুখ থেকে।' সাইফুদ্দিন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'একে এমন জায়গায় বন্দী করো, যেখান থেকে এর চিৎকারের আওয়াজ আমার কানে না আসে।'

ক্রুদ্ধ এক সেনাপতি দরজায় দাঁড়ানো রক্ষীকে ভেতরে ডাকলো।

কামরায় উচ্চকণ্ঠের তর্কাতর্কি শুনে রক্ষী তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ডাক পেয়েই দ্রুত সে ছুটে ভেতরে ঢুকলো। সেনাপতি তাকে বললো, 'এই খতীবকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে যাও।'

রক্ষীরা সম্মানিত খতীবকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে চললো। কিন্তু খতীব থামলেন না, তিনি তখনো চিৎকার করে বলছিলেন, 'সাইফুদ্দিন, এখনো সময় আছে, ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে এসো! ক্ষমতার নেশায় নিজের ঈমান, আমল ও ধর্মকে বিসর্জন দিও না! তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তি দেশ এবং জাতিকেও বেঁচে খায়। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। বন্ধুবেশী কাফের শত্রুর চেয়েও মারাত্মক! ফিলিস্তিন

আমাদের! ফিলিস্তিন আমার প্রিয় রাসূলের! আল্লাহ্‌রওয়াস্তে জিল্লতির হাত থেকে বাঁচাও জাতিকে!'

রক্ষীরা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কারাগারের দিকে আর তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, 'কাফেররা তোমাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে এ জন্য লাগিয়ে দিচ্ছে, যাতে তোমরা নিজেরা যুদ্ধে জড়িয়ে প্রিয় ফিলিস্তিনের কথা ভুলে যাও। ফিলিস্তিনে তাদের আধিপত্য স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখার এ এক মহা চাল! তোমরা যদি পরস্পর লড়াই করতে থাকো, বায়তুল মুকাদ্দাস তোমাদের ওপর অভিশাপ দিতে থাকবে।'

খতীব আল মাখদুম কাকবুরী যখন চিৎকার করে এসব বলছিলেন আর সৈন্যরা টেনে তাকে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এ দৃশ্য দেখে শহরের লোকজন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

চিৎকার শুনে বহু সৈন্য ব্যারাক ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, তাদের সকলের প্রিয় ও সম্মানিত খতীবের দুর্দশা ও দুর্গতির এক অভাবিত দৃশ্য!

মুহূর্তের মধ্যে খতীবের গ্রেফতারীর সংবাদ সমস্ত মুসালে ছড়িয়ে পড়লো।

সাইফুদ্দিনের লোকজন রটিয়ে দিল, 'খতীব আল মাখদুম পাগল হয়ে গেছেন। তাকে পাগলা গারদে বন্দী করে রাখা হয়েছে।'

এ সংবাদ এক সময় খতীবের বাড়ীতেও গিয়ে পৌঁছলো।

বাড়ীতে খতীবের যুবতী এক কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাপ-বেটির ছোট্ট সংসার খতীবের। স্ত্রী মারা গেলে একমাত্র মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আর বিয়ে করেননি। তিনি তার মেয়ের সেবা যত্নেই বেঁচে আছেন, মেয়েও বাবার আদরে বেঁচে আছে। দেখলে মনে হয় ওরা বেঁচে আছে শুধু একে অন্যের জন্য।

শহরের বহু গণ্যমান্য মহিলা ছুটে এলো খতীবের বাড়ীতে মেয়েকে সান্তনা দিতে। কারণ খতীব ছিলেন সকলের কাছেই খুব প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

মহিলারা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো, 'হঠাৎ করে তোমার বাবার এমন কি হলো? সত্যি কি তিনি পাগল হয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ! এমনটিই হওয়ার কথা ছিল!' মেয়েটি বললো, 'এমনটিই হওয়ার কথা ছিল!'

তার মধ্যে কোন আফসোস ও ভয়ের চিহ্ন ছিল না। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে সে সবার প্রশ্নের জবাবে বার বার শুধু বলছিল, 'হ্যাঁ, এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল!'

মুসালে খতীবকে কারাবন্দী করা হলো। ওদিকে হারান দুর্গে গুমাস্তগীন তার দুই সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখতকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে।

গুমাস্তগীন এই প্রথম জানতে পারলো, তার দুই সেনাপতিই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর লোক, তাঁর বিশ্বস্ত ও ঝানু গোয়েন্দা ছিল।

রাতে কারাগারে এলো গুমাস্তগীন। শামস বখত ও সাদ বখতকে তাদের কামরা থেকে বের করে জেরা করার জন্য নির্যাতন সেলে নিয়ে গেল।

সেখানে দু'জন লোককে আগে থেকেই লটকে রাখা হয়েছিল। শক্ত রশিতে দুই হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ওদের। পা মাটি থেকে দু'ফুট উঁচুতে। প্রতিটি পায়ের সাথে দশ সের ওজনের লোহা বাঁধা।

শীতের মওসুম। কিন্তু লোক দুটির শরীর থেকে এমনভাবে ঘাম বের হচ্ছিল, যেন তাদের গায়ে কেউ পানি ঢেলে দিয়েছে।

লোক দুটির বাহু কাঁধ থেকে ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম। এই অবস্থায় ওদের ওপর চাবুক পেটা করা হয়েছে। পিঠ, পেট, বুক, বাহুতে লেগে আছে রক্তের দাগ।

কামরা পঁচা রক্তের দুর্গন্ধে ভরপুর। হয়তো আশপাশে কোথাও পঁচা লাশ আছে, তাই এমন বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

'এদের দেখে নাও!' গুমাস্তগীন দুই ভাইকে বললো, 'এই কারাগারে আসার আগে তোমরা দুই ভাই আমার সৈন্য বিভাগের সেনাপতি ছিলে। রাজপুত্রের সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করেছো। কিন্তু এত সুখ তোমাদের কপালে সইলো না। দুর্ভাগ্য তোমাদেরকে টেনে নিয়ে এসেছে এই দোজখখানায়। তোমরা বিশ্বাসঘাতক, তোমরা আমার দুই পালিত সাপ! আমার সৌভাগ্য, ছোবল হানার আগেই তোমরা ধরা পড়ে গেছো।

আমি তোমাদের কি শাস্তি দেবো এখনও ঠিক করিনি। ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের ক্ষমাও করে দিতে পারি। আমাকে শুধু বলো, তোমাদের দুই লোককে দিয়ে যে মেয়েদের তোমরা এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছো, তাদের কোথায় পাঠিয়েছো? এখান থেকে তারা কোথায় গেছে ও কি গোপন তথ্য নিয়ে গেছে?'

গুমাস্তগীনের কথা শুনে শামস বখত ও সাদ বখত দু'জনেই হেসে দিল, কিন্তু তার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

দুই ভাইকেই চুপ করে থাকতে দেখে গুমাস্তগীন বললো, 'চুপ করে থেকো না, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তারা নিশ্চয়ই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে গেছে? কি, আমি কি মিথ্যা বললাম?'

তারা এবারও কোন উত্তর দিল না। গুমাস্তগীন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো, 'তাকাও এদের দিকে। দেখো এ দু'জনের কি অবস্থা! এরা যুবক মানুষ, তাই এখনো টিকে আছে। তোমাদের দু'জনকে এ অবস্থায় ফেললে, এতটা অত্যাচার তোমরা সইতে পারবে না। এর অনেক আগেই মনের সব কথা গড়গড় করে বলে দেবে। আমি চাই, তেমন অবস্থায় পৌছার আগেই তোমরা সব কথা বলে দাও।'

'তারা কোন গোপন তথ্য নিয়ে যায়নি!' শামস বখত বললেন, 'এখানে এমন কোন গোপন তথ্য ছিল না যা ওরা নিয়ে যেতে পারে। তোমার সম্পর্কে সুলতান আইয়ুবী সব কিছুই জানেন। তুমি যে খৃস্টানদের সাহায্য নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

প্রস্তুত হচ্ছো, তাও তিনি জানেন। ফলে ওদের নেয়ার কিছু ছিল না। গোপন তথ্য যা প্রকাশ পেয়েছে, তার সবই পেয়েছো তুমি।

আমরা দুই ভাই তোমার সৈন্য দলের সেনাপতি ছিলাম। তুমি আমাদেরকে খুব বিশ্বাসীও মনে করতে। কিন্তু আমরা যে সুলতান আইয়ুবীর লোক ছিলাম এই তথ্যটুকু ওরা না পালালে তুমি কোনদিনই জানতে পারতে না।'

'আমি আরো একটি গোপন তথ্য তোমাকে দিচ্ছি।' শামস বখতের ভাই সাদ বখত বললো, 'এ এক আকস্মিক ঘটনা। তোমার কাছে দু'জন মুসলমান মেয়ে উপঢৌকন হিসেবে এসেছিল। আমরা যখন জানলাম, মেয়ে দু'টি বড়ই মজলুম ও নির্যাতীতা, ওদের ওপর আমাদের মায়া হলো!

কিন্তু কাজী আবুল খাশিব তোমার আগেই মেয়ে দুটিকে তার নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ ধরলো। আমরা তাকে বিরত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আমাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে নিজের মরণ ডেকে আনলো।

মুসলিম দুই যুবতীর সম্ভ্রম বাঁচাতে আমরা বাধ্য হলাম ওদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা আমারই আপন কন্যা। তাই কাজী আবুল খাশিবের হাতে ওদের তুলে দিতে পারিনি।

কাজী আবুল খাশিবের হত্যা ও মেয়েদের পালানোর ব্যবস্থা করার খবর কানে গেলো তোমার। তুমি আমাদের কারাগারে বন্দী করলে।

যদি আমারা বন্দী না হতাম তবে আমাদের ইচ্ছা ছিল, সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তুমি যখন সামরিক অভিযান চালাবে, তখন আমরা আমাদের বাহিনীসহ সুলতান আইয়ুবীর অবরোধে পড়ে অক্ষত অবস্থায় তাঁর কাছে অস্ত্রসমর্পণ করবো। কিন্তু আমাদের সে আশা পূরণ হলো না।'

'তবুও আমরা সফল হয়েছি।' শামস বখত বললেন, 'তুমি আমাদের যত কষ্ট আর মৃত্যুদণ্ডই দাও, আমরা পরাজিত হবো না।

তুমি যদি ছাদের সঙ্গে লটকিয়ে আমাদের পায়ের সাথে বিশ সের ওজনের লোহা বেঁধে দাও, আমাদের বাহু আমাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও এবং তোমার আরো যা মন চায় সব রকম অত্যাচার করে আমাদের মেরে ফেলো, তবু আমরা বিজয়ের গৌরব নিয়েই বিদায় নেবো এ পৃথিবী থেকে।

আমরা কোন অত্যাচারের ভয়েই ভীত নই। মৃত্যুকেও আমরা ভয় পাই না। তুমি হয়তো জানো না, আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য যারা পাগলপারা, তাদের কাছে তীর ফুলের পরশ হয়ে যায়। তোমার অত্যাচার আমাদেরকে আল্লাহর আরো প্রিয় করে তুলবে। জান্নাত আমাদের আরো কাছে চলে আসবে। এরচে বড় সাফল্য মানুষের জীবনে আর কি আছে!

শোন গুমাস্তগীন, মানুষের শরীর ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু আত্মা অমর থাকে। আল্লাহর রাস্তায় জান কুরবানকারীর আত্মা আল্লাহর কাছে সবচে বেশী প্রিয় হয়।'

'খামোশ গাদ্দার!' গর্জে উঠলো গুমাস্তগীন। 'আমাকে নসিহত করতে হবে না। আমাকে সেই কথা বল্, যে রিপোর্ট তোরা সালাহউদ্দিনের কাছে পাঠিয়েছিস।'

'তুমি আমাদেরকে গাদ্দার বলছো!' শামস বখত বললেন, 'এটাও একটি গোপন বিষয়, যা একদিন প্রকাশিত হয়ে যাবে। গাদ্দার কে, এ প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যত। ইতিহাসই নির্ধারণ করবে কে গাদ্দার, আর কে নয়।

গুমাস্তগীন, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইতিহাস বড় নির্মম। একদিন সে সবাইকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেবে জাতির আসল গাদ্দার কে ছিল। ইতিহাস বলবে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ফিলিস্তিনকে খৃস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য জেহাদের ঝাণ্ডা হাতে যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন গুমাস্তগীন নামের এক মুসলমান গাদ্দার দুর্গাধিপতি তার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

'তোমরা যদি এতই পাকা মুসলমান, তবে ভারতকে হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে পালিয়ে এলে কেন? ঈমানদারদের কপালে তো পালানোর কলঙ্ক-কালি থাকে না!' গুমাস্তগীন বিদ্রূপ করে বললো, 'তোমরা দেশকে কাফেরের হাতে তুলে দিয়ে এখানে এসে ঈমানদারী ফলাচ্ছো?'

'ভারতকে আমরা হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসিনি, সেখানেও তোমাদের মত মুসলমান রয়ে গেছে।' সাদ বখত বললো, 'যারা হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব করে তোমাদের মত ক্ষমতার পাগল হয়ে গেছে। তাদের চোখে এখন কেবল

ক্ষমতা ও গদীর স্বপ্ন। আর হিন্দুরা পূর্ণ কতৃত্ব নিয়ে বসে আছে তাদের সহায়তায়।
আফসোস! সে দেশের ভাগ্য মুজাহিদদের হাতে নেই। সেখানকার মুসলিম শাসকরাও তোমাদের মতই গোলাম বানিয়ে রেখেছে সে দেশের ইসলামী জনতাকে।
আমাদের একজন মুহাম্মদ বিন কাশিম দরকার ছিল। সেই আবেদন নিয়েই আমরা এসেছিলাম মরহুম জঙ্গীর কাছে। তিনি আমাদের ওয়াদাও দিয়েছিলেন, তোমাদের মত গাদ্দারদের কবল থেকে আরব ভূমি মুক্ত করে আমাদের সঙ্গে যাবেন। কিন্তু আফসোস! সে সুযোগ তার হলো না।'
'আমি তোমাদেরকে আরও দুই দিন চিন্তা করার সুযোগ দিলাম।' গুমাস্তগীন বললো, 'যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তবে এই জাহান্নাম থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে তোমাদের আপন বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখবো। আর যদি আমাকে নিরাশ করো, তবে তোমাদের আমি মৃত্যুদণ্ড দেবো না, এই অন্ধকার কুঠরীতেই পঁচে গলে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে।
এখনও চিন্তা করো! দু'দিন পর আমি আবার তোমাদের কাছে আসবো।'
দুই ভাইকে ওখানে রেখেই বেরিয়ে গেলেন ক্রুদ্ধ গুমাস্তগীন। প্রহরী সেলের দরজা বন্ধ করে দিল। অন্তহীন অন্ধকার গ্রাস করলো বন্ধ কুঠরী।

গুমাস্তগীনের কেল্লায় খৃস্টান উপদেষ্টা ছিল। উপদেষ্টাকে সে ভালভাবেই বুঝাতে সমর্থ হলো, খৃস্টান কমাণ্ডার নিহত হয়েছে

তার নিজের ভুল ও অপকর্মের জন্য। তার হত্যার পেছনে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না।

গুমাস্তগীন বললো, 'সে আমার মহলের এক মেয়ের হাতে খুন হয়েছে।'

গুমাস্তগীন তাকে আরও জানালো, 'যে দু'জন সেনাপতি কাজীকে হত্যা করেছে তাদেরকে খুন ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে।'

এরপর সে উপদেষ্টার কাছে পরামর্শ চাইল, 'আমি অবিলম্বে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?'

'আমার তো জানা নেই, সেনাপতি দু'জন কি ধরনের গোপন তথ্য সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে পাঠিয়েছে। এটা না জেনে আমি আপনাকে কি পরামর্শ দেবো বুঝতে পারছি না।'

গুমাস্তগীন বললো, 'আইয়ুবী এই গোপন তথ্য পেয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগেই আমাদের আক্রমণ করা উচিত, যাতে সে সুবিধা করতে না পারে। আপনারা যদি আমাদের একটু সহযোগিতা করেন তবে আমরা নিশ্চিন্তে অভিযান চালাতে পারি।'

খৃস্টান উপদেষ্টা তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল এবং বললো, 'ঠিক আছে, আজই আমি একজন লোককে দিয়ে এ খবর কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সেই রাতেই খৃস্টান উপদেষ্টার পত্র নিয়ে এক লোক রওনা হয়ে গেল সেখান থেকে।

মুসালে খতীব আল মাখদুম কারগারের এক কুঠরীতে বন্দী। তার কন্যা সায়েকা বাড়ীতে একা। সারাদিন মহিলারা আসা-যাওয়া করলো তার কাছে।
খতীব এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে জানার জন্য এসব মহিলারা ছিল খুবই উদগ্রীব। কিন্তু সায়েকা তাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সবাইকে শুধু বলতো, 'যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে। পেরেশান হয়ে লাভ কি?'
মহিলারা এটাকে সায়েকার স্বাভাবিক আক্ষেপ বলেই ধরে নিয়েছে, কেউ এ কথার কোন অন্তর্নিহিত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেনি।
কিন্তু তার কথার ভঙ্গী এবং সবাইকে একই উত্তর দেয়ায় দু'টি মেয়ের মনে এ নিয়ে খটকা লাগলো। তারা বললো, 'সায়েকা, এই যে তুমি সবাইকে বলছো, যা হওয়ার তাই হয়েছে, এর মানে কি?'
সায়েকা এ কথারও জবাব দিল, 'যা হওয়ার তাই হয়েছে।'
ঘরে আরো মহিলা থাকায় মেয়েরা এ নিয়ে আর বিরক্ত করলো না তাকে। কিন্তু তাদের মনের খটকা ও সন্দেহ দূর হলো না এ জবাবে।
রাতে যখন সায়েকা একা, তখন সে দুই যুবতী আবার তার কাছে এলো। এরা ছিল সায়েকারই প্রতিবেশী। সায়েকা তাদেরকে ভাল মতই চিনতো।
'সায়েকা, তুমি সব সময় এ কথা কেন বলছো, 'এমনটাই হওয়ার কথা ছিল?' এক মেয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আল্লাহর এমনটিই মঞ্জুর ছিল।' সায়েকা উত্তর দিল, 'এ ছাড়া আমি আর কিই বা বলতে পারি!'

কিছুক্ষণ সবাই নীরব। শেষে অন্য মেয়েটি বললো, 'যদি এর অর্থ অন্য কিছু হয়, তবে স্পষ্ট করে বলো, হয়তো আমরা তোমার উপকারে আসতে পারি।'

'আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না।' সায়েকা বললো, 'আমার সম্মানিত বাবা এমন কোন গুরুতর অপরাধ করতে পারেন না, যার জন্য তাকে জেলে নেয়া যেতে পারে।

আমার বাবা মুসালের আমীরকে হয়তো সেই রূঢ় সত্য কথাটি বলে দিয়েছেন, যা তার পছন্দ নয়। তোমরা জানো, তিনি সব সময় সত্যবাদী ছিলেন এবং সত্য কথা বলতে গিয়ে কোন ভয় ভীতির তোয়াক্কা করতেন না।

এ জন্যই আমি বলছি, এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। কারণ তিনি তোষামোদ করার মত লোক নন। ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা তোষামোদকারী ছাড়া অন্যকে সহ্য করতে পারে না।'

'আল্লাহই ভাল জানেন, তিনি কি বলেছিলেন।' অপর মেয়েটা বললো, 'জানি না তিনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পক্ষে কিছু বলেছিলেন কিনা। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারো, তিনি মুসালের আমীরের পক্ষের লোক, নাকি সুলতান আইয়ুবীর পক্ষের?'

'তিনি সব সময় সত্যের পক্ষের লোক। যাকে তিনি সত্য মনে করেন তিনি কেবল তারই সমর্থক।' সায়েকা একটু হেসে

বললো, 'তোমরা কাকে সমর্থন করো?'

'আমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমর্থক।' দুই মেয়েই এক সঙ্গে উত্তর দিল।

'তিনিও মনে করতেন, সুলতান আইয়ুবীই সত্যের পক্ষে আছেন।' সায়েকা উত্তর দিল, 'সাইফুদ্দিন হয়তো তা জানতে পেরেছে।'

'তিনি কি মনে মনে তাকে সমর্থন করতেন, নাকি তার সক্রিয় সমর্থক ছিলেন?' এক মেয়ে বললো।

'তোমরা কি এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছো?' সায়েকা বললো, 'কেন, মুসালের মুসলমানরা কি সব গাদ্দার! তারা সবাই কি কাফেরদের সমর্থক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ! আমরা গোয়েন্দাগিরিই করতে এসেছি।' এক মেয়ে বললো, 'আর তোমাকে আশ্বস্ত করতে এসেছি, মুসালের যুবতীরা কাফেরের সমর্থক নয়। তারা আরবের মাটি থেকে কাফেরদের উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। জাতির এ দুর্দিনে আমরা চোখ-কান বন্ধ করে থাকতে পারি না। কোথায় কি ঘটছে সতর্কতার সাথেই আমরা তা লক্ষ্য করছি।

তুমিই চিন্তা করে দেখো, যেই তুমি বললে, 'এমনটিই হওয়ার কথা ছিল' আমরা এর মধ্যে রহস্যের গন্ধ পেলাম। আমরা বুঝতে পারলাম, তোমার আব্বা সুলতান আইয়ুবীর সমর্থক হবেন এবং মুসালের গভর্ণর তা টের পেয়েই তাকে বন্দী করেছে।

আমাদের মত তুমিও এ কথা বুঝতে পেরেছো বলেই তুমি সবাইকে বলছিলে, 'যা হওয়ার কথা তাই ঘটেছে।'
সায়েকা অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েরা বললো, 'কিন্তু দেখো, এ রহস্য আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি।'
কিছুক্ষণ কথাবার্তা ও মত বিনিময়ের পর সায়েকা বুঝলো, এই মেয়েরা তাকে ধোঁকা ও বিপদে ফেলতে আসেনি। সে তাদের প্রশ্ন করলো, 'এখন তোমরা কি করতে চাও? কিইবা করার ক্ষমতা আছে তোমাদের?'
'প্রথমে আমাদের জানতে হবে, শ্রদ্ধেয় খতীব সাহেবের ওপর কারাগারে কোন নির্যাতন হচ্ছে কিনা?'
অন্য মেয়ে বললো, 'যদি তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়, তবে তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে হবে। সে ব্যবস্থা আমরা করবো।'
'আমরা কেমন করে জানবো, কারাগারে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হচ্ছে?' সায়েকা বললো।
'আমরা আমাদের চেষ্টাতেই জেনে নিতে পারবো।' এক মেয়ে বললো, 'তবে তুমিও আমাদের সাহায্য করতে পারো।
তুমি মুসালের আমীরের কাছে যাও। তার কাছে তোমার পিতার সাথে দেখা করার অনুমতি চাও। যদি অনুমতি না দেন তবে আমরা অন্য ব্যবস্থা করবো।'
'আমি কাল সকালেই যাবো।' সায়েকা বললো, 'আর এ কথাও জিজ্ঞেস করবো, আমার বাবাকে কোন্ অপরাধে বন্দী

করা হয়েছে?'

মেয়েরা বিদায় নিতে যাবে, তাদের মনে হলো, সায়েকা তো এ বাড়ীতে সম্পূর্ণ একা! তারা তাকে বললো, 'তুমি তো একা! খালি বাড়িতে নিঃসঙ্গ রাত কাটানো বিপদজনক! তার ওপর তুমি এক যুবতী। ঠিক আছে, আমরা রাতে তোমার এখানেই থাকবো।'

কিন্তু সায়েকার তেমন ভয় করছিল না। কোন বিপদেরও আশংকা করছিল না সে। বললো, 'কি দরকার! আমার কোন ভয় করছে না। আমি একাই থাকতে পারবো।'

মেয়েরা তার এই আপত্তিকে গ্রাহ্য করলো না। তারা বাড়ী ফিরে গিয়ে নিজেদের গার্জিয়ানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলো রাতে সায়েকার কাছে থাকার জন্য।

তখন শীতকাল। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে তারা বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই অতলান্ত ঘুমের জগতে হারিয়ে গেল।

মাঝ রাতের একটু পর।

প্রকৃতির ডাকে একটি মেয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে এলো সে। বারান্দা পেরিয়ে সে উঠানে নামলো। উঠানের ওপাশে বাথরুম।

হঠাৎ উঠানের এক কোণে একটি কালো ছায়া নড়ে উঠলো বলে মনে হলো তার। কিন্তু অন্ধকারের কারণে স্পষ্ট দেখতে পেলো না। থমকে দাঁড়ালো মেয়েটি, সামান্য ভয়ও পেল। চুপ করে শুনতে চেষ্টা করলো, কোথাও কোন আওয়াজ হয় কিনা।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো, কোন কিছু নড়ে কিনা! কিন্তু না, সব কিছু চুপচাপ, সুনসান।

সে আবার এগুনোর জন্য পা বাড়াতে যাবে, মনে হলো আবার ছায়াটি নড়ে উঠলো এবং দেয়ালের ওপাশে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভয় ঢুকে গেল মেয়েটির অন্তরে। সে বাথরুমে না গিয়ে দ্রুত ফিরে এলো কামরায়।

কামরায় ফিরেই সে তার সঙ্গের মেয়েটিকে আলতো নাড়া দিয়ে ফিসফিস করে ডাক দিলো, 'এই!'

ঘুম ভেঙ্গে গেল মেয়েটির। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার!'

মেয়েটি যা দেখেছিল বললো তাকে।

দু'জনের কাছেই খঞ্জর ছিল। খঞ্জর হাতে নিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু তাদের চোখে সন্দেহজনক আর কিছুই পড়লো না।

বারান্দা থেকে এবার উঠানে নেমে এলো তারা। সায়েকাকে তারা কিছুই জানালো না, তাকে জাগালোও না।

কিন্তু কেমন করে যেন সায়েকারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে বিছানা হাতড়িয়ে দেখলো, যে দুই মেয়ে রাতে তার সাথে শুয়েছিল, ওরা কেউ বিছনায় নেই।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। ঘরে বাতি জ্বাললো। দেখলো, ঘরের দরজা খোলা। সে বারান্দায় এসে নাম ধরে ডাকলো তাদের।

তার ডাক শুনে মেয়েরা উঠোন থেকে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে এলো।
'কি ব্যাপার! বাইরে কি করছো তোমরা?' প্রশ্ন করলো সায়েকা।
যে মেয়েটি বাথরুম করতে বেরিয়েছিল সে বললো, 'বাথরুমে যেতে গিয়ে বাইরে উঠানের পাশে মানুষের ছায়া নড়তে দেখলাম। মনে হলো, এখানে কেউ ওঁৎ পেতে আছে।'
'এখন কোথায় সে লোক?'
'এখন তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!' হতাশ কণ্ঠে বললো মেয়েটি।
'যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।' সায়েকা তাদেরকে বললো, 'তোমরা বাইরে এসে কি দেখতে কি দেখেছো, কে জানে! কোন ছায়া দেখলেই তাতে আঘাত হানতে হবে, এ বুদ্ধিই বা তোমাদের কে দিল?'
মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'মনে হয় এটা কোন মানুষের ছায়া না, হয়তো হুজুরের কোন ভক্ত জ্বীনের! নইলে ভোজবাজীর মত সে অদৃশ্য হয়ে গেল কি করে?'
'যারই ছায়া হোক, ও নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। তোমরা নির্ভয়ে ঘুমুতে যেতে পারো।' সায়েকা বললো।
সায়েকার অভয় বাণীতে তারা বরং আরো ভয় পেলো। ভয় তাদের মানুষকে নয়, অন্য কিছুর। তবে কি সত্যি এটা জ্বীনের ছায়া ছিল? নইলে সায়েকা ছায়াকে আঘাত হানতে নিষেধ করলো কেন?

তিনজনই বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এলো। এক মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সায়েকা, সত্যি করে বলো তো, আসলেই কি ওটা জ্বিনের ছায়া ছিল?'
'জানি না। তবে এরা আমার বাবার ভক্ত ও অনুসারী। তাদরেকে তোমরা জ্বীনই মনে করো, আর যা-ই মনে করো। আমি তাদের কাছে কোনদিন যাইনি। আমার বিশ্বাস, তারা আমাদেরকে পাহারা দিতেই রাতে বাড়ির চারপাশে ঘোরাফেরা করে।'
'শ্রদ্ধেয় খতীব যেমন পরহেজগার, তেমনি সম্মানিত।' একটি মেয়ে বললো, 'তাঁর ভক্ত ও অনুসারী যেমন মানুষ, তেমনি জ্বীনেরাও তার ভক্ত হতে পারে।'
'হতেই পারে!' সায়েকা বললো, 'সে জন্যই বলছি, তোমরা তাদের ভয়ও পেও না, আবার তাদের কাছেও যেও না।'
খতীব সাহেব কারাগারের এক কামরায় বন্দী। তিনি জানেন না, সাইফুদ্দিন তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে।
একজন প্রহরী টহল দিচ্ছিল তার কামরার সামনে। খতীব তাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'আমাকে একটি কোরআন শরীফ দিতে পারো?'
'কোরআন শরীফ? এখানে.......!' প্রহরী অবাক হয়ে বললো, 'এখানে তো হুজুর কোরআন পাঠের লোক আসে না! এই জাহান্নামে আমি কোরআন শরীফ কোথায় পাবো! এখানে শুধু পাপীরাই আসে। আসে চোর, ডাকাত, খুনী। ওদের তো কোরআনের দরকার হয় না! এখানে কোন কোরআন শরীফ

নেই। আপনি শুয়ে থাকুন।' প্রহরী ডিউটিতে চলে গেল।
খতীব সাহেব কোরআনের হাফেজ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর অনেক সুরা ও আয়াত মুখস্ত ছিল। তিনি সুললিত কণ্ঠে সুরা আর রাহমান পাঠ করতে শুরু করলেন।
নিশুতি রাতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো খতীব ইবনুল মাখদুমের যাদুময় মিষ্টি কণ্ঠের সুর। কারাগারের দুর্বহ পরিবেশে এক মোহময় আবহ সৃষ্টি হলো। কেবল সে কামরা নয়, সমগ্র কারাগারেই ভেসে বেড়াতে লাগলো হৃদয় উজাড় করা সে সুরের মুর্ছনা।
যখন সুরা পড়া শেষ হলো, তাঁর মনে হলো, ওখানে তিনি শুধু একা নন।
তিনি দরোজার দিকে তাকালেন, দেখলেন, উর্দি পরা জেল দারোগা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুর ধারা।
'কে আপনি?' জেল দারোগা খতীবকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি ছয় বছর ধরে এই জেলখানার দায়িত্বে আছি। এখানে কোরআন পাঠের শব্দ এই প্রথম শোনলাম।'
সে আরো বললো, 'এমন সুললিত কণ্ঠের কোরআন তেলাওয়াত আমি জীবনেও শুনিনি। কোরআনের বাণী এই প্রথম আমার মনের গভীরে প্রবেশ করলো। এ কিতাব আমার মাতৃভাষায় লিখিত, অথচ এমন করে কোরআনের অর্থ আর কোনদিন আমার অন্তরে ঢেউ তোলেনি।'
'আমি মুসালের খতীব!' খতীব তাঁর পরিচয় দিলেন।

'আপনি এমন কি অপরাধ করেছেন যে, আপনার মত সম্মানিত ব্যক্তি আজ কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী?' জেল দারোগা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

খতীব উত্তর দিলেন, 'আমার অপরাধ বড় গুরুতর, আমি তোমাদের বাদশাহর আদেশ অমান্য করে কোরআনের আদেশকে প্রাধান্য দিয়েছি।'

'আপনি আবার পড়ুন!' দারোগার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো বিগলিত অনুরোধ, 'আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এ এমন এক ব্যাধি, যার থেকে বাঁচার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি। যেই আপনি সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত শুরু করলেন, আমার মনের বিষ ধীরে ধীরে বের হতে শুরু করলো। হুজুর, আমি কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করছি, আপনি আবার একটু কোরআন পড়ুন।'

খতীব আগের চেয়েও আবেগ ঢেলে এমন করুণ স্বরে সুরা আর রাহমান পড়লেন, মনে হলো বিশ্ব প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে শুনছে এ তেলাওয়াত।

দারোগা কামরার মোটা লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখ থেকে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রু।

খতীব সুরা শেষ করে চুপ করলেন। দারোগা চোখ বন্ধ করে সুরা আর রাহমানের একটি আয়াত বার বার আওড়াতে লাগলো। এক সময় সে চোখ খুলে বললো, 'আপনার কণ্ঠ এত সুমধুর ও যাদুময়, এমন তেলাওয়াত শুনতে নিশ্চয়ই

জ্বীনেরাও নেমে আসবে মাটির পৃথিবীতে।'

দারোগা বললো, 'শুনেছি কোরআন মানুষের সব জিজ্ঞাসারই জবাব দেয়। আপনি কি কোরআন থেকে আমার একটি প্রশ্নের জবাব বের করে দেবেন?'

খতীব বললেন, 'কোরআন তো শুধু ঈমানদারদের প্রশ্নেরই সমাধান দেয়।'

'আর যাদের ঈমান দৃঢ় নয় তাদের?'

'তাদের মনে ঈমানের আলো উজ্জ্বল করে।' খতীব বললেন, 'তোমার প্রশ্নটা কি শুনি?'

দারোগা বললো, 'আমার মনের মধ্যে এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা আছে! জানি না এটা ঈমানের আলো, না কি প্রতিশোধের অগ্নিশিখা! আমি সেই সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে চাই, যারা জেরুজালেম জয় করবে। আমার এ আশা কি পূরণ হবে?'

'যদি তুমি জেরুজালেম বিজয়ের অংশীদার হওয়ার আকাঙ্খী হয়ে থাকো, তবে শুনে রাখো, তুমি অতি সত্বর সেখানে পৌছে যাবে, যে বাহিনী জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।' খতীব বললেন, 'মুসলমানের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস শত্রু মুক্ত করার স্বপ্ন তো একজন খাঁটি ঈমানদারের স্বপ্ন! তুমি প্রতিশোধের কথা বলছো কেন?'

'আমি কোন কয়েদীর সাথে এমন ভাবে কথা বলি না।' দারোগা বললো, 'আপনি আমার আত্মায় যে প্রশান্তির প্রলেপ মেখে দিলেন, সে কারণে আপনার সাথে প্রাণ খুলে কথা

বলছি। আমার আত্মার শান্তি প্রয়োজন।'
একটু থেমে সে বললো, 'আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের বাসিন্দা! আমার জন্মভূমি আজ খৃস্টানরা জবর দখল করে রেখেছে। মুসলমানদের সেখানে ভেড়া-বকরির চেয়েও নিকৃষ্ট পশু মনে করা হয়।
খৃস্টানরা সেখানকার মুসলমানকে যখন ইচ্ছা গরু ছাগলের মত জবাই করছে। যাকে ইচ্ছা কারাগারে পাঠাচ্ছে। যাকে ইচ্ছা ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটাচ্ছে। যুবতী মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এরপরও আপনি জানতে চান কিসের প্রতিশোধ নিতে চাই আমি?
জেরুজালেমের প্রতিটি মানুষ আজ অক্ষম আক্রোশে নিজেদের মাথার চুল ছিড়ছে। তাদের অন্তরে প্রতিনিয়ত ধিকিধিকি জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন।'
'আমি জানি। সবই জানি আমি। তাইতো সেখানকার মুসলমানরা আজ সুলতান আইয়ুবীর পথ পাণে চেয়ে আছে।' বললেন খতীব।
'সাত বছর আগের ঘটনা।' দারোগা বললো, 'একদিন এক খৃস্টান আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল তার কাজের জন্য। কাজটি ছিল ভারী বোঝা বহন করে তার বাড়ীতে পৌছে দিতে হবে।
আমি অভিজাত পরিবারের সন্তান। কখনো বোঝা বহন করিনি। তাই সে আমাকে বোঝা উঠাতে বললে, আমি অস্বীকার করলাম।

সে আমার মুখের ওপর থাপ্পড় মেরে বললো, 'মুসলমান হয়ে তুই আমার বোঝা উঠাতে অস্বীকার করিস! এত বড় সাহস তোর!'

আমারও মাথায় তখন রাগ চড়ে গেল। আমি তার মুখে জোরে একটি ঘুষি মারলাম। সে পড়ে গেল। আমি তার মাথার চুল ধরে টেনে তুলে আবার ঘুষি মারলাম। সে আবারও পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে কয়েকজন খৃস্টান এসে পেছন থেকে আমাকে জাপটে ধরলো। দেখতে দেখতে সেখানে ভীড় জমে গেল খৃস্টানদের। ছুটে এলো খৃস্টান সিপাইরা। তারা আমাকে মারতে মারতে বেগার ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

সেখানে আমি তিনদিন কাটালাম। তৃতীয় দিন রাতের বেলা এক প্রহরীকে পিছন থেকে ঝাপটে ধরে তার খঞ্জর কেড়ে নিয়ে তাকে খুন করে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। তারপর ছুটলাম বাড়ির দিকে।

রাতেই বাড়ী গিয়ে পৌছলাম। আমার ভয় ছিল, রাতারাতিই আমার গোষ্ঠীর সমস্ত লোককে সে এলাকা থেকে সরিয়ে আনতে না পারলে পুরো গোষ্ঠীর ওপরই ওরা ব্যাপক ধ্বংসলীলা শুরু করে দেবে।

কিন্তু বাড়ি পৌঁছে দেখি, আমি পৌঁছার আগেই আমার বাড়ীটা ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে মাটির সাথে মিশে আছে। ওখানে আমার পরিবারের কোন লোককেই পেলাম না।

আমি আমার এক মুসলিম প্রতিবেশীর দরজায় গিয়ে করাঘাত করলাম। সে ভয়ে ভয়ে দরজা খুললো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বাড়ীর ওরা সব গেছে কোথায়?'
সে যা বললো তাতে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। সে বললো, 'খৃস্টানরা আমাদের পরিবারের সব পুরুষকে ধরে বেগার ক্যাম্পে নিয়ে গেছে।'
আমার দু'টি অবিবাহিত বোন ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদের কি হয়েছে?'
সে জানালো, 'খৃস্টান সৈন্যরা ওদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে। যাওয়ার আগে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। যতক্ষণ ঘরে আগুন জ্বলছিল ততক্ষণ একদল সৈন্য বাড়ির চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাতে কেউ আগুন নেভাতে না পারে।'
তখন আমার মনের কি অবস্থা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। আমি চিন্তা করে দেখলাম, আমার বোনদের আর ফিরে পাবো না। পরিবারের অন্যান্যদের মুক্ত করাও আমার সাধ্যের বাইরে। যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, আমাকেও ধরা পড়তে হবে। আর আমাকে আবার ধরতে পারলে আমার মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে।
সেখানে আমার ওপর কি পরিমাণ নির্যাতন ও অত্যাচার করা হবে ভাবতেই শিউরে উঠলাম আমি।
আমি কোন মুসলমানের ঘরে আশ্রয় নেয়ার মত বোকামী আর করলাম না। কারণ আমি জানি, এখন আমি যার ঘরেই আশ্রয় নেবো, খৃস্টানরা টের পেলে তার সমস্ত বাড়ী ধ্বংস

করে দেবে। সে বাড়ীর লোকজনদের খুন করবে, নয়তো গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে বেগার ক্যাম্পে।

আমি দেরী না করে সে রাতেই জেরুজালেম থেকে বের হয়ে এলাম। রক্ত আমার টগবগ করছিল, কিন্তু আমি অসহায়। আমি কোথায় যাবো, কি করবো তার কোন ঠিক ছিল না। কোনকিছু না ভেবেই আমি একদিকে হেঁটে চললাম।

ভোর হয়ে এলো। সূর্য উঠলো ফাঁকা রাস্তায়। আমি হেঁটেই চলেছি। বিপর্যস্ত অবস্থা আমার।

দেখতে দেখতে ভোরের কুয়াশা ও রোদের মিষ্টি আমেজ সরে গিয়ে তেতে উঠল সূর্য। এ সময় এক খৃস্টানকে দেখলাম ঘোড়ায় চড়ে আমার দিকেই আসছে। এ লোক সৈনিক ছিল না, সাধারণ এক খৃস্টান নাগরিক।

লোকটি কাছে এলে আমি তাকে থামিয়ে একটু পানি চাইলাম। সে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা চামড়ার থলে থেকে যেই আমাকে পানি দিতে হাত বাড়াল, আমি হেঁচকা টানে তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলাম।

লোকটি এমন অতর্কিত হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে মাটিতে উঠে বসার আগেই তার কোমর থেকে তলোয়ার কেড়ে নিলাম।

লোকটি খালি হাতে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু আমি তার তলোয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর তার ঘোড়ায় চড়ে ছুটলাম খৃস্টান অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার জন্য।

এই নিয়ে দু'জন খৃস্টানকে আমি হত্যা করলাম। কিন্তু তাতেও আমার মনের আগুন নেভেনি। আমার মনে হচ্ছিল, অত্যাচারী সব খৃস্টানকে আমি একাই শেষ করে ফেলি।

এই রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে আমি পাগলের মত ছুটছিলাম। সারাদিন, সারারাত কত যে ঘুরে বেড়ালাম তার ইয়ত্তা নেই। কোথায় কোথায় ঘুরে বেরিয়েছি মনে নেই আমার।

ক্ষুধা ও পিপাসার অনুভূতি মরে গিয়েছিল আমার। বারবার কেবল মনে হচ্ছিল, বাপ-মার কথা, ভাই-বোনদের কথা। নিজের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

কখনো ঘোড়া থামিয়ে খৃস্টানের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া তলোয়ার উঁচিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমার শরীর কাঁপতে শুরু করতো। চোখ ঝাপসা হয়ে যেতো। কতক্ষণ এভাবে কেটে যেতো খেয়াল থাকতো না।

আমি বারবার আল্লাহকে ডাকলাম। বললাম, 'হে আল্লাহ, আমাদের কোন্ পাপের জন্য এ শাস্তি দিচ্ছো আমাদের? আমি পাপী হলে তার শাস্তি তো আমারই পাওয়া উচিত! আমার ছোট্ট দু'টি বোন ও শিশু ভাইটি তো নিষ্পাপ। তাদের কেন শাস্তি দিচ্ছো আল্লাহ!'

কিন্তু আমার কোন প্রশ্নেরই কোন জবাব পেলাম না আমি। আমি বারবার সিজদায় পড়ে আল্লাহকে ডাকলাম। কিন্তু মনের আগুন তাতেও নিভলো না।

শেষে আমি আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা শুরু করলাম, 'হে

আল্লাহ তুমি আমার মন থেকে প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দাও। আমার সব স্মৃতি ভুলিয়ে দাও। আমার মনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে দাও। আমার অন্তরকে অনুভূতিশূন্য করে দাও'।'

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আমি মুসালের এক গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে ভয়ের কোন আশংকা ছিল না। কোন খৃস্টান ধরে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেবে, এখন আর এ ভয় নেই। কিন্তু তারপরও আমার মনে কোন শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এলো না। প্রতিটি মুহূর্ত অশান্ত ও অধীর চিত্তে কাটতে লাগলো আমার।

আমি গ্রামের মসজিদে চলে গেলাম। ইমাম সাহেবকে বললাম, 'আল্লাহকে পাওয়ার পথ দেখিয়ে দিন আমায়। বলুন, কোথায় গেলে আমি আমার আত্মার শান্তি ফিরে পাবো?'

কিন্তু ইমাম সাহেবও ব্যর্থ হলো আমাকে শান্ত করতে। আমি সেখান থেকে ছুটে গেলাম অন্য গ্রামে, সেখান থেকে ছুটলাম আরেক গ্রামে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। রাত হলে মসজিদে কাটিয়ে দিতাম রাত। দিনের বেলা ছুটে বেড়াতাম এখান থেকে ওখানে।

প্রায় রাতেই বোনদের স্বপ্নে দেখতাম। তাদের ফোঁপানো কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে যেতো আমার। মনে হতো, ওরা আমাকে তিরস্কার করছে, অভিশাপ দিচ্ছে আমাকে।

একদিন এক লোক আমাকে বললো, 'খৃস্টানদের ওপর প্রতিশোধ নিতে হলে সেনাবাহিনীতে যোগ দাও।'

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী ফিলিস্তিন্ মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করছেন, এ কথা তো আমার জানাই ছিল। তার নেতৃত্বে খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসে বসে খবর পেতাম কোন্ ময়দানে কে কখন হারলো, আর কে জিতলো।

জেরুজালেমে খৃস্টানরা যখন আমাদের ওপর অত্যাচার, উৎপীড়ন চালাতো তখন আমরা তাদের অত্যাচারের ধরণ দেখে বুঝতাম, যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ওরা কেমন মার খেয়েছে।

মুজাহিদদের হাতে মার খেয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ওরা ঝাপিয়ে পড়তো নিরস্ত্র মুসলমান প্রজাদের ওপর।

এরপর আমরা শুনতে পেলাম গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নাম। এই নাম শুনলেই খৃস্টানদের চেহারায় ভয়ের বিভীষিকা নেমে আসতো। তারা তার নিন্দা ও গালমন্দ করতো।

সেখানে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল, সুলতান আইয়ুবী ঝড়ের মত ছুটে আসছে। কিন্তু দিনের পর দিন গেল, সেই ঝড় আর আঘাত হানলো না বায়তুল মোকাদ্দাসে। সেখানকার মুসলমানদের আশার প্রদীপ হয়ে তাদের অন্তরে তখনো জ্বলছিল একটি নাম, গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

আমি মুসালের সেনা দলে ভর্তি হয়ে গেলাম। কিন্তু কোন সমর ক্ষেত্রে না পাঠিয়ে আমাকে এই কারাগারের দায়িত্বে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

এখানে এসে দেখলাম আমি উৎপীড়ন ও নির্যাতনের আরো

অনেক নতুন রূপ। এত বিচিত্র উপায়ে মানুষের ওপর অত্যাচার চালানো যায়, এই দায়িত্বে না এলে আমি জানতেই পারতাম না।'

দারোগা আরো বললো, 'এখানে আমি মানুষের ওপর এমন উৎপীড়ন হতে দেখেছি, তাতে আমি নিজেই কেঁপে উঠেছি। জেরুজালেমে খৃস্টানরা মুসলমানদের ওপর যেমন উৎপীড়ন চালাচ্ছে, এখানে মুসলমানরাই মুসলমানের ওপর সেই উৎপীড়ন করছে। এখানেও নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরে এনে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আর সে শাস্তি দিতে হচ্ছে আমাকেই।

আমি বুঝতে পারছি, কেন আপনাকে এখানে এনে বন্দী করা হয়েছে। আপনাকে শাস্তি দেয়ার কাজও হয়তো আমাকেই দেয়া হবে। আপনি জানেন না, আমরা কত ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারি। আমাদের নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনলে আপনি বেহুশ হয়ে যাবেন।

আমার সহকর্মীদের স্বভাব পশুর মতই নিষ্ঠুর ও নির্বোধ। তাদেরকে মানুষ বলতে হয় এ জন্য যে, তারা মানুষের মত চলতে ও কথা বলতে পারে। নইলে মানবিক বোধ বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই তাদের মধ্যে।

আমি এখনো ততটা পশু হয়ে উঠতে পারিনি। বন্দীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার পর এখনো গোপনে আমি কষ্ট ও বেদনা অনুভব করি। অত্যাচার করার আগে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কি তাদের অপরাধ?

কিন্তু সহানুভূতির এই প্রেরণা আমার মনকে হালকা করার পরিবর্তে আরও ভারী করে দেয়। আমার মনে শান্তি আসে না, আমার চোখের সামনে থেকে আমার বোনদের সেই স্মৃতিও সরে যায় না। আমার মনে শুধু এই অনুভবই জাগে, যতদিন পর্যন্ত খৃস্টানদের ওপর প্রতিশোধ নিতে না পারছি, ততদিন আমি অশান্ত ও অধীর থাকবো।

আজ আপনার মুখে কোরআনের যে বাণী শুনলাম, 'তোমরা তোমার প্রতিপালকের কোন্ কোন্ দানকে অস্বীকার করবে?' জানিনা এ কথা শুনে আমার মনে কেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে সেই পথ বলে দিতে পারবেন, যেখান আমি একটু শান্তির পরশ পাবো।'

সে গরাদের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খতীব ইবনুল মাখদুমের জোব্বার প্রান্ত ধরে অধীর কণ্ঠে বললো, 'হুজুর, বলুন, কোথায় গেলে আমি একটু শান্তি পাবো? কেমন করে আমি প্রতিশোধ নেবো? আমার মাথায় সব সময় রক্ত চড়ে থাকে। আমি কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবো?'

খতীব বললেন, 'তুমি তো আল্লাহর কালাম শুনেছো! আল্লাহর সীমাহীন দান থেকে নিরাশ হতে নেই। তুমি প্রতিশোধের নেশায় অধীর হয়ে আছো। কিন্তু এখানে থেকে তুমি তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না। তুমি যে সেনাপতির অধীনে আছো, সে কোনদিন বায়তুল মুকাদ্দাস যাবে না।'

'কেন! কেন যাবে না?'

'কারণ সাইফুদ্দিনের সৈন্য বাহিনী সুলতান আইয়ুবীকে

পরাজিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।' খতীব উত্তর দিলেন, 'খৃস্টানদের সাথে আঁতাত করে সে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফয়সালা করেছে।'

দারোগার দৃষ্টি খুলে গেল। খতীব তাকে বুঝিয়ে বললেন, মুসলমান শাসকরা এখন কি করছে।

দারোগা বললো, 'আমি বেশ কিছুদিন ধরে এ ধরনের কথা শুনে আসছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, আমাদের শাসকরা আমাদের সেই সব বোনদের আর্তনাদের কথা ভুলে যাবে, যারা খৃস্টানদের পশুত্বের শিকার হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে।'

'তারা সব ভুলে গেছে।' খতীব বললেন, 'তারা তাদের কথা শুধু ভুলে যায়নি, নিজেদের ঈমান এবং বিবেককেও হারিয়ে ফেলেছে। এরা এখন নিজেরাই মুসলমান মেয়েদেরকে অপহরণ করে উপহার ও উপঢৌকন হিসেবে বিভিন্ন আমীরদের কাছে পাঠাচ্ছে। এসব মেয়েদের ওরা উপভোগের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। নিজেদের অন্দর মহল ও দরবারের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করছে ওদের।

সুলতান আইয়ুবী এই বিলাসিতা ও বেহায়াপনার বিরোধীতা করেন। তাই এ বিলাসপ্রিয় আমীর ও শাসকদের শত্রু তিনি। সুলতান আইয়ুবী কোরআনের নির্দেশ অমান্য করে যারা জাতির মান সম্মান ও ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনিই এখন মুসলিম মিল্লাতের শেষ আশা ভরসার স্থল।

এই দায়িত্ব পালনে তিনি এমনি নিবেদিতপ্রাণ, তাঁর কোন বাড়ী বা ঠিকানা আছে কি না সে দিকে তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁর জীবন ও যৌবনকে তিনি মরুভূমি ও পাহাড় পর্বতের রণক্ষেত্রেই অতিবাহিত করে দিচ্ছেন।

আমার অপরাধও তাই, আমি মুসালের আমীরকে কোরআনের নির্দেশ মত চলতে বলেছিলাম। তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম, কোন মর্দে মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তোমার পরাজয় নিশ্চিত।

কোরআনের যে পবিত্র বাণী একটু আগে তোমাকে শুনিয়েছি, যে বাণী তোমার ওপর যাদুর মত প্রভাব ফেলেছে, আমি সেই কালামই মুসালের আমীরকে শুনিয়েছিলাম। তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম, তোমার মত পাপিষ্ঠদেরই মাথার চুল ও পা ধরে পাকড়াও করা হবে।

আমি তাকে কোরআনের এ আদেশও শুনিয়েছিলাম, যদি তুমি মন মগজ থেকে ক্ষমতার মোহ ত্যাগ না করো তবে জাহান্নামের গরম পানির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হবে তোমাকে। কিন্তু সে আল্লাহর আদেশ মানতে অস্বীকার করলো, আর আমাকে এ উপদেশ দেয়ার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করলো।'

'আপনার এখানে খুব কষ্ট হবে।' দারোগা তাঁকে বললো, 'দেখি, আমি আপনার কোন উপকারে আসতে পারি কিনা।'

'পার্থিব কোন দণ্ড বা শারীরিক শাস্তি আমাকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না।' খতীব বললেন, 'দুনিয়ার এই জাহান্নামে আমি

কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছি। আল্লাহর পথের মুসাফির এসব কষ্টকে কষ্ট মনে করে না।
হ্যাঁ, একটি বিষয়ে আমি বেশ মনোকষ্টে আছি। আমার একটি মাত্র কন্যা, সে যুবতী! অনেক দিন হলো আমার স্ত্রী মারা গেছে। আমি শুধু ওই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করিনি। আমার সেই কলিজার টুকরার নিরাপত্তা নিয়ে আমি বড়ই দুশ্চিন্তায় আছি। ও একদম একাকী অবস্থায় কি করে যে একটি বাড়ীতে থাকবে এটাই আমার বড় ভাবনা!'
'আমি তার দেখাশোনা করবো।' দারোগা বললো।
'সকলেরই মোহাফেজ এক আল্লাহ।' খতীব বললেন, 'আমি তোমাকে আমার বাড়ীর ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আমার একমাত্র কন্যা সায়েকাকে বলবে, সে যেন মন শক্ত করে বাড়ীতেই থাকে। আমার ব্যাপারে যেন কোন চিন্তা না করে। যদি এখানে কোরআন পাঠে কোন বিধিনিষেধ না থাকে তবে আমার মেয়েকে বলবে, সে যেন আমার কোরআন শরীফটা তোমার কাছে দিয়ে দেয়।'
দারোগা ভোরেই খতীবের বাড়ী চলে গেল। তাঁর কন্যা সায়েকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'তুমি তোমার পিতার সম্পর্কে কোন দুশ্চিন্তা করো না। তিনি ভালো আছেন এবং আল্লাহর পথে আছেন।'
দারোগা সায়েকাকে আরো বললো, 'তোমার বাবার মত মহত ও নেককার লোক আর হয় না। আমি একদিনেই তোমার বাবার ভক্ত হয়ে গেছি। তাঁকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করবো

আমি। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্তও আমাকে মানতে হবে। কারণ আমি সরকারের একজন সামান্য কর্মচারী মাত্র। সাধ্য থাকলে আমি তাকে মুক্ত করে দিতাম।'

সে সায়েকাকে বললো, 'তোমার বাবা বলেছেন তার কোরআন শরীফটা নিয়ে যেতে।'

সায়েকা বললো, 'বসুন। আমি কোরআন শরীফ এনে দিচ্ছি।'

দারোগা বসলে সে তার সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা বললো। এ আলাপের মাধ্যমে সে আশ্বস্ত হলো, দারোগা অন্তর থেকেই তার বাবার মঙ্গল কামনা করে।

এক পর্যায়ে দারোগা আবেগময় কণ্ঠে বললো, 'তোমার বাবার জন্য আমি জীবনের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত।'

সায়েকা বললো, 'আপনি তো জানেন, কি অপরাধে বাবাকে কারাগারে আটকে রেখেছে। আমার ভয় হয়, সাইফুদ্দিন তাকে না নির্যাতন সেলে নিয়ে যায়! বাবা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সহযোগী এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না সাইফুদ্দিন।

আচ্ছা, তাকে কি কারাগার থেকে পালানোর সুযোগ করে দেয়া যায় না? আমরা পিতা ও কন্যা দু'জনই মুসাল থেকে পালিয়ে যেতাম তাহলে?'

দারোগা একটু হেসে বললো, 'আল্লাহর যা মঞ্জুর হয় তাই হবে। আমি তো তাকে আমার শ্রদ্ধেয় পিতার আসনে বসিয়ে নিয়েছি। তার চোখে ঈমানের যে জ্যোতি দেখেছি তাতে তিনি পালাতে রাজি হবেন কিনা জানি না। যদি তিনি রাজি হন,

তবে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার নেক ইচ্ছা আমার আছে। দোয়া করো, আল্লাহ্ যেনো আমাকে আমার এ নেক ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দেন।'

'আমি আপনার জন্য দোয়া করবো এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও করবো।'

'তুমি মেয়ে মানুষ। বয়সে তরুণী। তুমি কিছু করতে যেয়ো না এবং এ গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশও করতে যেয়ো না।'

'আমি আব্বা হুজুরের জন্য কোরআন শরীফ নিয়ে আসছি।'

সায়েকা ভেতরে চলে গেল। দারোগা বসে রইলো।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এলো সায়েকা। তার হাতে কোরআন শরীফ।

সে কোরআন শরীফটি দারোগার হাতে দিয়ে বললো, 'আমি মুসালের আমীরের কাছে যাচ্ছি, বাবার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইবো তার কাছে।'

'হ্যাঁ, যাও। দেখা করার এটাই নিয়ম।' দারোগা বললো। তারপর কোরআন নিয়ে চলে গেল সে।

সায়েকা প্রস্তুত হয়ে সাইফুদ্দিনের দরবারে রওনা হলো। দরবারের বাইরে শাহী ফটকে থামিয়ে দেয়া হলো তাকে।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মত সাইফুদ্দিন সবাইকে প্রকাশ্যে ও খোলাখুলি দেখা করার সুযোগ দিতো না। গভর্ণর হলেও তার চালচলন ছিল রাজার মত।

মদ পান ও অন্দর মহলে আমোদ-স্ফূর্তি করেই সময় কাটতো

তার। মহলে চলতো নাচ-গানের জমজমাট আসর। বাকী সময় কাটাতো সুলতান আইয়ুবীকে কি করে মোকাবেলা করবে সেই পরিকল্পনা করে।

দেশের জনগণের কোন খবর সে রাখতো না। তাদের অভাব অভিযোগ শোনার মত অবসরও ছিল না তার। পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে তার কোন বাছবিচার ছিল না। এ নিয়ে কোন ভয়ও ছিল না তার। জনসাধারণের কাছে তার একটাই প্রত্যাশা ছিল, তারা যেন তার নিরঙ্কুশ আনুগত্য করে।

সায়েকা সাইফুদ্দিনের সাথে দেখা করতে গেলে দারোয়ান তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি?'

'আমি মুসালের খতীব ইবনুল মাখদুমের কন্যা সায়েকা।'

দারোয়ান শুনেছিল, খতীব হঠাৎ পাগল হয়ে গেছেন এবং তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

খতীবকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। এ খবর শুনে সবাই যেমন বিস্মিত হয়েছিল তেমনি সমবেদনাও অনুভব করেছিল অন্তরে।

দারোয়ান তাকে বললো, 'তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি দেখি তিনি তোমাকে দেখা করার অনুমতি দেন কিনা?'

দারোয়ান একজনকে দিয়ে সাইফুদ্দিনের কাছে খবর পাঠালো, 'খতীব ইবনুল মাখদুমের কন্যা আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

একটু পর ফিরে এলো প্রহরী। বললো, 'মনিব তাকে ভেতরে

পাঠিয়ে দিতে বলেছে।'
সাইফুদ্দিনের অনুমতি পেয়ে গেট খুলে দিল দারোয়ান। প্রহরী সায়েকাকে বললো, 'আসুন আমার সাথে।'
সে সায়েকাকে সাইফুদ্দিনের দরবারে নিয়ে গেলো।
সাইফুদ্দিন বসেছিল দরবারে। সায়েকাকে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। মানুষ নয়, যেনো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক পরী। সে এ মেয়ের রূপ ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো
সাইফুদ্দিন ছিল এক ধুরন্ধর মেয়ে শিকারী। সে সায়েকাকে সাগ্রহে পাশে বসার ইঙ্গিত করে বললো, 'আরে! দাঁড়িয়ে আছো কেন? বসো!'
সে বুঝতে পারলো মেয়েটা কেন তার কাছে এসেছে।
সায়েকা তার বাবার মুক্তির আবেদন জানানোর আগেই সাইফুদ্দিন বলে উঠলো, 'দেখো, মেয়ে! আমি জানি, তুমি কেন এসেছো। আমি নিরুপায় হয়েই তোমার বাবাকে কারাগারে বন্দী করেছি।'
সে সায়েকার কাছে তার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস না করেই বললো, 'যদি তাকে দু'এক দিনের মধ্যে মুক্তি দেয়া সম্ভব হতো তবে তাকে আমি বন্দীই করতাম না। আমি তাকে মুক্তি দিতে পারব না।'
সায়েকার চেহারা মলিন হয়ে গেল, কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে জ্বলে উঠলো ঈমানের জ্যোতি। সায়েকা নির্ভয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলো সাইফুদ্দিনের দিকে, 'তার অপরাধটা কি?'

'তার অপরাধ গাদ্দারী।' সাইফুদ্দিন বললো।
'তিনি কি খৃস্টানদের সাথে হাত মিলিয়েছেন?'
'না, তিনি খৃস্টানদের সাথে হাত মিলাননি, তবে আমার শত্রুর পক্ষ নিয়েছেন।'
'আমি তো জানতাম মুসলমানের শত্রু হচ্ছে খৃস্টান! তিনি যদি খৃস্টানের সাথে হাত না মিলিয়ে থাকেন তবে তিনি আপনার বিরুদ্ধে গাদ্দারী করলেন কিভাবে?'
'রাজ্যের শত্রু, সে খৃস্টান হোক বা মুসলমান, তার সাথে যোগসাজস মানেই রাজ্যের ক্ষতি করা। এটা রাষ্ট্রীয় অপরাধ এবং এমন অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।' সাইফুদ্দিন প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাবা কি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমর্থক নন?'
সায়েকা উত্তরে বললো, 'আমি বলতে পারবো না, তিনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমর্থক কিনা। তবে তিনি যদি আইয়ুবীর সমর্থকও হন, আমি সেটাকে দোষের মনে করি না।'
'আমি বুঝতে পারি না, তোমরা বাপ-বেটি এমন আহাম্মকের মত কথা বলছো কি করে? তোমরা কি জানো না, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মিশর থেকে ছুটে এসেছেন? যে লোক আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় তার পক্ষে কথা বলা কি অন্যায় নয়?'
তৎক্ষণাৎ এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারলো না সায়েকা। কিভাবে সে বুঝাবে, সুলতান আইয়ুবী এক মর্দে মুজাহিদ। তিনি মুসলমানদের শত্রু নন, বরং তিনিই এখন মুসলিম

মিল্লাতের আশা ভরসার শেষ আশ্রয়, একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু!
ভাবছিল সে, সাইফুদ্দিন বললো, 'আমি আশ্চর্য হই, লোকেরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে ফেরেশতা মনে করে কেমন করে? সে তো মেয়েদের ব্যাপারে একটা পশু! দামেশক ও কায়রোতে তার অন্দর মহল তোমার মত শত শত যুবতী মেয়েদের দিয়ে ভরে রেখেছে সে। কোন মেয়েকেই সে তিন চার মাসের বেশী কাছে রাখে না। একটু পুরনো হলেই ওদেরকে সে দিয়ে দেয় সেনাপতিদের হাতে।
যুদ্ধের সময় তার সেনাবাহিনী যখন কোথাও আক্রমণ করে, তখন তারা মোটেও ভাবে না, এটা মুসলমানের বাড়ী, নাকি অমুসলমানের। বিজিত প্রতিটি বাড়ীঘরে সে লুটপাট করে, যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় সঙ্গে। তোমার মত সুন্দরী মেয়ে তার চোখে পড়লে রেহাই নেই।'
সাইফুদ্দিন আরো বললো, 'তুমি আমার প্রজা, তোমার মানসম্মান রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। তোমার বাবার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই। আমি তাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আমার বন্দী করতে হলো।
তিনি ছাড়া তোমার তো আর কেউ নেই, তাই না? আমি তোমার অসহায়তা বেশ বুঝতে পারছি। তুমি যে তোমার নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছো, তাও বুঝতে পারছি। আমার তো মনে হচ্ছে, তোমাকে আর তোমাদের বাড়িতে পাঠানো ঠিক হবে না। একা একা খালি বাড়ীতে থাকা ঠিক হবে না

তোমার।'

সাইফুদ্দিন সায়েকাকে অভয় দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, কোন চিন্তা করো না তুমি। তোমার আব্বার মুক্তির আগ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে তোমাকে আমার মহলেই রাখার ব্যবস্থা করে দেবো।'

'আমার হেফাজত আল্লাহই করবেন।' সায়েকা বললো, 'আমি আমার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করছি না। আপনার কাছে আমার ছোট্ট একটি আরজি, আমাকে শুধু কিছুক্ষণের জন্য আমার বাবার সাথে দেখা করার অনুমতি দিন।'

'এ ধরনের অপরাধীদের সাথে কাউকে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয় না। যতক্ষণ কাজী তার শাস্তির রায় ঘোষণা না করছে, ততক্ষণ এমন আদেশ আমি দিতে পারবো না।'

'এ ধরনের অপরাধীদের শাস্তির কি রায় হতে পারে?' সায়েকা জিজ্ঞেস করলো।

'মৃত্যুদণ্ড!'

সায়েকা বুঝলো, তার আব্বা এখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অপেক্ষা করছেন। সে এমন এক দুরাচারের পাল্লায় পড়েছে, কন্যা হয়ে বাপের সাথে শেষ বারের মত একটু দেখা করার সুযোগও তাকে দেবে না এই পাষাণ্ড।

সায়েকা খুবই শক্ত মনের মেয়ে ছিল। কিন্তু এবার আর সে নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না। তার চোখ থেকে ফোটা ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

তাকে আরও ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য সাইফুদ্দিন বললো,

'কিন্তু সে মৃত্যুও সহজভাবে হবে না। তলোয়ার দিয়ে এক কোপে মাথাটা কেটে নিলো বা হঠাৎ দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এমন নয়। তার মৃত্যু ঘটবে ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে নির্যাতন করে মারা হবে তাকে।'

প্রথমে তার চোখ উপড়ানো হবে। তারপর সাড়াশি দিয়ে টেনে তোলা হবে দাঁত। তারপর তার হাত পায়ের আঙ্গুল কাটা হবে। এরপর তার গায়ের চামড়া খুলে নেয়া হবে। এভাবে কঠিন শাস্তি দিয়ে মারা হবে তাকে।

ভয়ে সায়েকার সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরলো দাঁত দিয়ে। তার চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সে কম্পিত স্বরে বললো, 'আপনি কি তার প্রতি এতটুকু দয়া করতে পারেন না, তার মাথাটা তলোয়ার দিয়ে এক কোপে কেটে দেবেন? যদি তাঁকে মৃত্যুদণ্ডই দেয়া হয়, তবে তাকে মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করতে অসুবিধা কোথায়?'

'কেন তাকে আমি দয়া করবো? তার প্রতি কি দায় ঠেকেছে আমার? সে রাজদ্রোহী, উপযুক্ত শাস্তিই কি তার প্রাপ্য নয়!

তবে তুমি যদি দয়া করতে বলো, সে আলাদা কথা। তোমার মত পাগল করা রূপসীর আবেদন অগ্রাহ্য করার মত অমানুষ আমি নই।

তোমার বাবার প্রতি যদি তোমার দয়া হয়, তবে তুমি আমার কাছে তোমার বাবার প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারো। বিনিময়ে আর যাই হোক, তোমার কাছে আমি তোমার প্রাণ দাবী

করবো না।'
সায়েকা বাঁকা চোখে চাইলো তার প্রতি। ব্যঙ্গ আর তিরস্কার মিশিয়ে বললো, 'তাহলে কি চাইবেন?'
সাইফুদ্দিন বললো, 'বাবার মৃত্যুর পর তুমি হবে এক অনাথ এতীম। তোমার মত গরীব ও দু:খী মেয়েকে কেউ বিয়েও করতে চাইবে না। তার চেয়ে এটাই কি ভাল নয়, তোমার বাবা আবার মুসালের খতীব হয়ে যাক, আর তুমি হয়ে যাও মুসালের রাণী?'
'যদি আমার বাবা আমাকে আত্মসম্মানবোধ না শিখাতেন তবে রাণী হওয়া তো অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার! আমি আপনার এক রাতের রাণী হওয়াকেও গর্ব ও অহংকারের বিষয় মনে করতাম!
কিন্তু আমি জানি, আমার পিতা আমার সম্ভ্রম রক্ষার্থে হাসতে হাসতে তার গায়ের চামড়া খুলে দেবেন। এ দরাদরি আপনি আমার বাবার সাথেই করবেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি জল্লাদের কাছে যেতে চাও, নাকি তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠাতে চাও?'
এ ব্যাপারটি আপনি তার সাথেই ফয়সালা করবেন। বাপজান যে ফয়সালা দেবেন, সেটিই আমার ফয়সালা। তবে আমি জানি, তিনি অবশ্যই বলবেন, 'আমাকে জল্লাদের কাছেই পাঠিয়ে দাও।'
সাইফুদ্দিন তাকিয়ে ছিল সায়েকার দিকে। বললো, 'তোমার নিজের কোন ফয়সালা নেই?'

'আমার কথা আমি বলেছি। এখন আমি আপনার ফয়সালা শুনতে চাই। আমি শুধু একটি আবেদন নিয়ে এসেছি, কিছুক্ষণের জন্য আমার বাবার সাথে দেখা করার সুযোগ দিন।

আপনি আমার আবেদন প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন, কবুলও করতে পারেন। আমি ওয়াদা করছি, এরপর আর কোনদিন আমি এ নিয়ে আপনার সাথে দরকষাকষি করতে আসবো না।'

'এটাই কি তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আর কোনদিন তুমি আমার কাছে আসবে না?' সাইফুদ্দিন জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।' সায়েকা বললো, 'জানি, আপনি মুসালের বাদশাহ! ইচ্ছে করলে আমাকে জোর করে আপনার হেরেমে আটকে রাখতে পারেন। কিন্তু তাতে আমার সিদ্ধান্ত নড়চড় হবে না!'

'সায়েকা, আমাকে আর অপরাধী বানিয়ো না। তোমার ওপর জুলুম করবো এমন কোন ইচ্ছে আমার নেই।' সাইফুদ্দিন বললো।

সায়েকা উঠে দাঁড়ালো। সে যা জানতে ও বুঝতে এসেছিল, তা তার জানা হয়ে গেছে।

সে তো শুধু জানতে চেয়েছিল, কারাগারে তার বাবার সাথে কেমন ব্যবহার করা হচ্ছে? আর জানতে চেয়েছিল, বাবাকে নিয়ে সাইফুদ্দিন কি করতে চায়? এটা তো এখন সে ভাল মতই জানতে পেরেছে।

সায়েকার বিশ্বাস ছিল, দারোগা তার বাবাকে মুক্ত করে পালিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ অবশ্যই করে দেবে। সে সাইফুদ্দিনকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

সাইফুদ্দিন তাকে যেতে দেখে বললো, 'দাঁড়াও! মুসালের আমীর একটি মেয়ের ছোট্ট একটি আবেদন মঞ্জুর করতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন অপবাদ আমি শুনতে চাই না। তুমি আজই তোমার বাবার সাথে দেখা করতে পারবে।'

সায়েকা ঘুরে দাঁড়ালো। বললো, 'কখন?'

'আজ রাতে।'

'কেমন করে দেখা করবো?'

'রাতে একজন লোককে তোমাদের বাড়ী পাঠাবো। সে তোমাকে কারাগার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।'

'কতক্ষণ কথা বলার সময় পাবো?'

'তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা তোমার বাবার সাথে কথা বলতে পারবে। কারারক্ষীকে আমি জানিয়ে দেবো এ খবর।'

সায়েকা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো দরবার থেকে।

সায়েকা বেরিয়ে গেলে সাইফুদ্দিন তার বডিগার্ডের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই সুন্দর পাখিটাকে আমি আমার খাঁচায় চাই। আমি তাকে ভয় দেখানোর জন্য তার বাবাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে মারা হবে বলেছিলাম। কিন্তু মেয়েটি এত শক্ত, সহজে বশে আনা মুস্কিল! জানো, আমি তাকে কেন বলেছি, আজ রাতে তোমার বাড়ীতে একজন লোক পাঠাবো। সে তোমাকে কারাগারে পৌঁছে দেবে?'

'আমি আহাম্মক, কিন্তু এমন গাধা তো নই যে, আপনার ইঙ্গিত বুঝি না?' বডিগার্ড মুখে শয়তানী হাসি টেনে বললো, 'সে লোক আমিই হবো। আমিই তাকে রাতে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তার বাড়ী থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে যাবো।'

'আর তুমি কি জানো, তাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?'

এবারও হাসলো বডিগার্ড, 'সবই জানি! এ কাজ তো আর নতুন করছি না! আমি তাকে এমন গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে আপনার কাছে পৌছাবো, সে বুঝবে, এ দুনিয়ায় আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যে তার প্রেমিক ও দরদী। কি করে অবাধ্য পাখিকে খাঁচায় পুরতে হয় আমি ছাড়া কে তা বেশী জানে?'

সাইফুদ্দিন বডিগার্ডের কানে কানে আরো কিছু কথা বললো। বডিগার্ডের চোখে যেন শয়তান নাচতে লাগলো, হাসতে লাগলো সে।

কারাগারের দারোগা সায়েকাকে সান্ত্বনা দিয়ে কোরআন নিয়ে চলে গেল। আজও তার রাতেই ডিউটি।

সন্ধ্যার পরপরই সে ডিউটিতে এসে যোগ দিল। দিনে যার ডিউটি ছিল সে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দারোগা অফিস থেকে বেরিয়ে খতীব ইবনুল মাখদুমের কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এদিক-ওদিক ভালভাবে লক্ষ্য করে কোরআন শরীফটি আদবের সাথে খতীবের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'মেয়েকে নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। সে ভাল এবং নিরাপদেই আছে। আপনার মেয়ে

যথেষ্ট ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমতী।'

'সে কিছু বলেছে?'

'সে আপনাকে দোয়া করতে বলেছে আর বলেছে.....' কথা শেষ না করে চুপ করে গেল দারোগা।

'আর কি বলেছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন খতীব।

দারোগা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো আশে পাশে কেউ নেই। তারপরও মুখ গরাদের একদম কাছে নিয়ে নিচু কণ্ঠে বললো, 'আপনাকে পালিয়ে যেতে বললো। বললো, মুশাল থেকে আপনারা পালিয়ে যেতে চাইলে আমি যেনো সাহায্য করি। আপনি যদি সাহস করেন আমি আপনাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করবো।'

'আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে। মুমিনের কখনো সাহসের অভাব হয় না।' খতীব বললেন, 'কিন্তু তোমার সাহায্য নিয়ে আমি পালাতে চাই না। তোমাকে বিপদে ফেলার চেয়ে এখানে মরে যাবো, তাও ভালো।'

'কেন?' দারোগা বিস্মিত হয়ে বললো, 'আমি গোনাহগার বলে কি আমার সাহায্য নিতে আপনার এ আপত্তি?'

'না।' খতীব বললেন, 'আমি তোমার সাহায্য এ জন্য নেবো না যে, তুমি একজন সরল ও নিষ্পাপ লোক। আমি তোমার সাহায্য নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু তুমি তো পালানোর সুযোগ পাবে না! তুমি ধরা পড়ে গেলে আমার অপরাধের সমস্ত শাস্তি তোমার ওপর পড়বে, সেই সাথে তোমার অপরাধের শাস্তি তো আছেই। তুমি কল্পনা করতে

পারো, দ্বিগুণ শাস্তি তোমার ওপর পড়লে কি ভীষণ অবস্থা হবে?'

'আমিও আপনার সাথেই যাবো।' দারোগা বললো, 'আপনার গত রাতের কথাগুলো আমার চোখ খুলে দিয়েছে। এই জাহান্নামে আমি আর থাকতে চাই না। এই পরিবেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য আমার মন ছটফট করছে। আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সেনা দলে ভর্তি হতে চাই।

আমি এখানে বন্দী নই। ফলে সহজে এবং বিনা বাঁধায় আমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু আমি একা এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো? আপনি জানেন, এ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। আমার অন্তরে কি জ্বালা সে কথাও আপনার অজানা নয়। এ জ্বালাকে শীতল করতে আমি আপনার সঙ্গী হতে চাই।'

'হ্যাঁ, এ অবস্থায় আমি তোমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি।'

'সায়েকা বলেছিল, সে মুশালের আমীর সাইফুদ্দিনের কাছে আপনার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতে যাবে। সে আপনার সাথে দেখা করতে আসেনি?'

'না।' খতীব ভীত কণ্ঠে বললেন, 'সাইফুদ্দিনের মত শয়তানের সামনে তার যাওয়া মোটেই ঠিক হবে না। তুমি তাকে গিয়ে নিষেধ করে বলো, সে যেন কিছুতেই ওখানে না যায়!'

'ঠিক আছে, কাল ভোরেই আমি ওকে নিষেধ করে আসবো।' বললো দারোগা।

খতীবের কামরার সামনে থেকে সরে গেল দারোগা। খতীব কোরআন শরীফে চুমু দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। আপন মনেই বললেন, 'এখন আমি আর এই কামরায় একা নই।'

তিনি গেলাফ খুলে বাতির সামনে বসে পড়ে কোরআন শরীফের পাতা উল্টালেন। কোরআনের মধ্য থেকে একটি ছোট্ট চিঠি বের হয়ে পড়লো। সায়েকা লিখেছে, 'আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনার ভক্ত জ্বিনেরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। আর পয়গাম বাহকের খবর সঠিক, আমার ঈমান সতেজ আছে!'

খতীবের মুখ খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি কাগজের টুকরাটি প্রদীপের শিখায় ধরে পুড়িয়ে ফেললেন।

পয়গাম বাহক বলতে যে দারোগাকে বুঝানো হয়েছে বুঝলেন তিনি। জ্বীনেরা বলতে বুঝানো হয়েছে দারোগার নিজস্ব লোকদের।

যে সময় খতীব কাগজের টুকরাটি পুড়ছিলেন, ঠিক সে সময় সায়েকার দরজায় এসে নক করলো কেউ। সায়েকা দরজা খুললো, তার হাতে প্রদীপ।

বাইরে যে লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সায়েকা তাকে চিনতে পারলো। সকালে সে তাকে দেখেছিল সাইফুদ্দিনের ওখানে। এ লোকই সাইফুদ্দিনের বডিগার্ড।

লোকটি সায়েকাকে বললো, 'আমি আপনাকে আপনার বাবার সাথে দেখা করার জন্য নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কিন্তু এত রাতে আমি আবার ফিরবো কি করে?'
'আমিই আবার আপনাকে বাড়ীতে এনে পৌছে দিয়ে যাবো।'
সায়েকা প্রস্তুত হয়েই ছিল, সে ওর সাথে বাড়ী থেকে রাস্তায় নেমে এলো।
বডিগার্ড বললো, 'তুমি শুধু বাবার কুশলাদি সম্পর্কে কথা বলতে পারবে। পারিবারিক বিষয় ছাড়া অন্য কোন আলাপ করার অনুমতি নেই। তোমার আব্বার সাথে কথা বলার সময় দরোজা থেকে অন্ততঃ দুইগজ দূরে থাকবে। আর এমন কোন কথা বলবে না, যে কথা মুশালের আমীরের বিরুদ্ধে যায়।'

বডিগার্ড আগে আগে যাচ্ছিল। সায়েকা তার দুই তিনগজ পিছনে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে।
অন্ধকার রাত। তারা অন্ধকার এক গলি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি মোড় ঘুরে হঠাৎ বডিগার্ড থেমে গেল। সায়েকা জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার?'
সে পিছনে তাকিয়ে বললো, 'তুমি কি পিছনে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পাওনি?'
'না তো!' সায়েকা বললো, 'আমিই তো তোমার পিছন পিছন যাচ্ছি!'
'না, আমার মনে হলো, আরও কারো পায়ের শব্দ আমি শুনতে পেয়েছি।' বডিগার্ড আস্তে করে বললো এবং ভীত সন্ত্রস্তভাবে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো।
'এতে ভয়ের কি আছে?' সায়েকা বললো, 'যদি কেউ পিছে

পিছে আসে তো আসুক না, সাথী হবে।'

বডিগার্ড কোন উত্তর করলো না। গলিটা শেষ হয়ে এলো। সামনে কোন বসতি নেই। ফাঁকা ময়দান ও অসমান উঁচু নিচু মাঠ। মাঠের ওপাশ থেকেই শুরু হয়েছে আবার লোকালয়। মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটি নালা। নালার পাড় ধরে এগিয়ে চললো ওরা।

ওখান থেকে কারাগার তখনো বেশ দূরে। দু'জনেই নালার পাশ দিয়ে সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে। নালার পাশে এখানে ওখানে ঝোঁপ-ঝাড় ও গাছপালা।

বডিগার্ড আবারও থেমে গেল এবং পিছনে লক্ষ্য করলো।

পিছনে তখনও কারো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সে তলোয়ার হাতে পিছনে চলে গেল। দু তিনটি ঝোঁপ-ঝাড় ও তার আশপাশে খুঁজে দেখলো, কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পেল না।

'এবার তো তুমি পিছনে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছো।' বডিগার্ড সায়েকাকে জিজ্ঞেস করলো।

এবারের শব্দটা সায়েকা স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু সায়েকা এবারও অস্বীকার করে বললো, 'তুমি তো আচ্ছা ভীতু! কোথায় কোন খরগোশ বা জংলী প্রাণী একটু নড়াচড়া করলো আর অমনি তুমি এমন ভাব করছো, যেন ডাকাতের পাল্লায় পড়েছো।'

'আমি যে জন্য ভয় করছি, সংকোচের কারণে সে কথা তোমাকে বলতে পারছি না।'

'কেন? কিসের ভয়? আমাকে বলতেই বা তোমার অসুবিধা কি?'

'কোন অসুবিধা নেই।' বডিগার্ড বললো, 'তুমি শুধু অসামান্য সুন্দরীই নও, সেই সাথে যৌবন সুষমায় সুশোভিত এক পরিপূর্ণ যুবতী। তোমার মূল্য তুমি হয়তো নিজে বুঝতে পারছো না। পারলে এতটা নিরুদ্বিগ্ন হতে পারতে না। তোমাকে কেউ ছিনতাই করে নিয়ে গিয়ে কোন আমীরের কাছে বিক্রি করতে পারলে সে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। তুমি এখন আমার জিম্মায় রয়েছো। এ মুহূর্তে তুমি কিডন্যাপ হয়ে গেলে মুশালের আমীর আমাকে খুন করে ফেলবে। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকো, পিছনে থেকো না।'

সায়েকা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে পাশাপাশি চলতে লাগলো।

মাঠ শেষে আবার পায়ে চলা পথ শুরু হলো। সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ। এ চিকন পথ ধরেই এগুতে লাগলো ওরা।

আরেকটু সামনে এগুলেই পথটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে।

বডিগার্ড সায়েকাকে নিয়ে দু'পথের মোড়ে পৌঁছলো। এ সময় মনে হলো পিছন থেকে কেউ দৌড়ে আসছে। ওরা আবারও থমকে দাঁড়ালো।

এক লোক পিছন থেকে দৌড়ে ওদের পাশ কেটে ডান দিকের রাস্তা ধরে ছুটে গেল। বডিগার্ড তলোয়ার হাতে নিয়ে ওর দিকে মাত্র দু'কদম এগিয়েছে, হঠাৎ কেউ পিছন থেকে সায়েকাকে জাপটে ধরলো।

লোকটি সায়েকার কণ্ঠ রোধ করার আগে সে কোনমতে ছোট্ট একটি চিৎকার শুধু দিতে পেরেছিল।

বডিগার্ড পিছন ফিরে দেখলো, এক লোক সায়েকাকে জাপটে ধরেছে, আরেক লোক তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তাকে বস্তার মত মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলছে।

বডিগার্ড সায়েকার দু'পাশে দুই লোকের কালো ছায়া দেখে যেই সেদিকে এগুতে যাবে, ছুটে যাওয়া লোকটি ফিরে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো আরেক লোক। সে ছুটে এসে বডিগার্ডের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তাকেও বস্তার ভেতর ঢুকিয়ে দিলো।

এ বডিগার্ড ছিল বেশ স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান। কিন্তু তাকে যারা ধরে রেখেছে, তারা সংখ্যায় অধিক এবং তারাও শক্তিশালী হওয়ায় সে তাদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারলো না।

ওদিকে সায়েকাকে যারা ধরেছিল তারা তাকে বস্তায় পুরে বস্তার মুখ বেঁধে ফেললো। অল্পক্ষণের মধ্যে বডিগার্ডকেও অনুরূপভাবে বস্তায় পুরে বস্তার মুখ বন্ধ করে দিল।

এই অতর্কিত ও কমাণ্ডো স্টাইলের হামলায় দু'জনেই ধরাশায়ী হলে কমাণ্ডোরা তাদেরকে পিঠে তুলে নিলো।

একটুপর ওরা বড় রাস্তায় উঠে এলো। কাঁধ থেকে বস্তাবন্দী দু'জনকে মাথায় তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো ওরা।

রাস্তায় লোক চলাচল তেমন ছিল না। যে দু'একজন অন্ধকারে

ওদের পাশ কেটে গেলো তারা বুঝতেই পারলো না, মাথায় করে ওরা কি নিয়ে যাচ্ছে।
সবার অলক্ষ্যে দু'জন মানুষকে ছিনতাই করে ওরা কিছুদূর গিয়ে এক অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।
অন্ধকার গলিপথে কিছু দূর এগিয়ে এক সংকীর্ণ বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলো ওরা।
বাড়ির মধ্যে ভূতুড়ে অন্ধকার। ওরা সেই অন্ধকারের মধ্যেই ভিতরে গিয়ে সায়েকাকে এক কামরায় এবং বডিগার্ডকে অন্য একটি কামরায় নিয়ে গেলো।
সায়েকার বস্তার মুখ খুলে দেয়া হলো। বের করে নেয়া হলো তার মুখে গুঁজে দেয়া কাপড়।
এক লোক দ্রুত হাতে প্রদীপ জ্বাললো। কামরার অন্ধকার দূর হয়ে গেলে সায়েকা দেখতে পেলো তার সামনে দু'জন লোক দাঁড়ানো।
সায়েকা রাগে কাঁপতে কাঁপতে অনুচ্চ কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললো, 'তোমরা একি বিশ্রী পদ্ধতি গ্রহণ করেছো?'
'এটিই নিরাপদ পদ্ধতি।' পাশে দাঁড়ানো দু'জনের একজন বললো, 'রাস্তায় তোমাকে কেউ দেখে ফেললে বিপদ হতো। তার চেয়ে গোপন করে আনাই সবচে নিরাপদ ও জরুরী ছিল।'
'আমাকে আগে কেন বলোনি, তোমরা এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে?' সায়েকা প্রশ্ন করলো, 'আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এ আবার কোন্ ডাকাত দলের হাতে পড়লাম!'

'কমাণ্ডোদের নিয়ম কানুন এমনটিই হয়। আগে থেকে সবকিছু পরিষ্কার করে বলা যায় না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হয়।' অন্যজন বললো।

'তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলে যে, সে আমাকে কারাগারে না নিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল?' সায়েকা প্রশ্ন করলো।

'তুমি যখন সাইফুদ্দিনের বাড়ী থেকে বের হয়ে এসে জানিয়েছিলে দিনের বেলা নয়, রাতে তোমাকে দেখা করার সুযোগ দেবে, তখনই আমাদের মনে এ সন্দেহ জেগেছিল। আর সে যখন তোমাকে সোজা পথে না নিয়ে অন্ধকার ও সংকীর্ণ পথে রওনা দিলো তখন তো সন্দেহের কোন অবকাশই রইলো না।' অন্য জন উত্তর দিল।

'যদি সে তোমাকে সত্যিই কারাগারের দিকে নিয়ে যেতে চাইতো তবে সে এই বিজন মাঠের নালার পাশের চিকন রাস্তা ধরে এগুতো না। সে তোমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই আমাদেরকে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়েছে।'

'সে কয়েকবারই তোমাদের পায়ের শব্দ শুনে ছিল।' সায়েকা বললো, 'এমন অসাবধান হওয়া উচিত হয়নি তোমাদের।'

'অন্ধকারের কারণে দূরত্ব বেশী হলে তোমাকে হারিয়ে ফেলার ভয় ছিল। সে জন্য তোমাদের থেকে বেশী দূরে থাকার রিস্ক নিতে পারছিলাম না। তাছাড়া বাজে রাস্তা শুকনো ঘাস-পাতায় ভরা ছিল বলে সাবধানতার পরও পুরোপুরি নিঃশব্দে

এগুনো সম্ভব হয়নি।'

সায়েকার চেহারা থেকে অস্থিরতার ভাব দূর হলো। সেখানে নেমে এলো স্বাভাবিক শান্তি ও স্বস্তির ভাব। সে ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, 'আল্লাহর হাজার শোকর, তোমাদের কারণে দুরাচার বডিগার্ডের হাতে অপহৃত ও লাঞ্ছিত হতে হয়নি। আল্লাহ তার নেক বান্দাদের এভাবেই অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেন। তোমাদেরকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

অন্য এক কামরায় বডিগার্ডকে বস্তার ভিতর থেকে বের করা হলো। তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিলে সে দেখলো, তার সামনে তিনজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে। তার তলোয়ারটি এক মুখোশধারীর হাতে।

'কে তোমরা?' বডিগার্ড খুব দাপটের সাথে জিজ্ঞেস করলো, 'জানো, আমি মুশালের আমীরের স্পেশাল বডিগার্ড! তোমাদের এ বেয়াদবীর জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে। ডাকাতি করার আর জায়গা পাও না?'

'মুশালের আমীরের বডিগার্ড!' এক মুখোশধারী হেসে বললো, 'আল্লাহ কারো মৃত্যুর ফয়সালা করলে কেউ তা ঠেকাতে পারে না। আমীরকে রক্ষা করার চিন্তা বাদ দিয়ে এখন নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবো। সত্যি করে বলো, এই মেয়েটাকে ভাগিয়ে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'কারাগারে তার বাবার সাথে দেখা করাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম।' বডিগার্ড উত্তর দিল, 'এ মেয়েকে অপহরণ করে তোমরা

কিছুতেই হজম করতে পারবে না। তোমরা জানো না, এ মেয়ে খতীব ইবনে মাখদুমের কন্যা। মুশালের আমীর গাজী সাইফুদ্দিন তার জন্য নিজের ব্যক্তিগত বডিগার্ডকে পাঠিয়েছেন।

তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো, এ মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলে মুশালের আমীর প্রতিটি ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাবে। তোমরা ওকে নিয়ে শহর থেকে বের হতে পারবে না।

একটু পরই এ মেয়ে ও আমার নিখোঁজ সংবাদ জেনে যাবেন মুশালের আমীর। যখন সারা শহর ঘেরাও করে তাকে উদ্ধার করা হবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো?'

'শোন বন্ধু!' এক মুখোশধারী বললো, 'এ মেয়েকে কেউ অপহরণ করেনি। সে নিখোঁজও হয়নি, বরং নিখোঁজ হওয়া থেকে বেঁচে গেছে। আমরা জানি, এ মেয়ে মুশালের আমীর সাইফুদ্দিনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এও জানি, তার অনুসন্ধানে প্রয়োজনে মুশালের আমীর কেবল নিরাপত্তা বাহিনীকে নয়, সেনা বাহিনীকেও ব্যবহার করবে। কারণ এ মেয়ে অসাধারণ সুন্দরী এবং পরিপূর্ণ যুবতী। আর কোন সুন্দরীর প্রতি তার চোখ পড়লে সে মেয়ের নিস্তার নেই।'

'এ মেয়ে নিখোঁজ হওয়া থেকে বেঁচে গেছে বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছো তোমরা?'

'আমরা জানি, তার বাবা কারাগারে বন্দী। সাইফুদ্দিনকে তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন বলেই তাঁর আজ এ অবস্থা।

সাইফুদ্দিন বড় ধুরন্ধর ব্যক্তি। বাবাকে কারারুদ্ধ করে

মেয়েকে তিনি বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছেন শর্ত সাপেক্ষে। বলেছেন, তাকে কারাগারে নিয়ে যাবে তাঁরই পাঠানো বডিগার্ড।'

'হ্যাঁ, বলেছেন। এতে অন্যায়টা কি হলো? একজন যুবতী মেয়ে রাতের অন্ধকারে একলা চলাফেরা করবে, এটা তিনি ঠিক মনে করেননি বলেই আমাকে পাঠিয়েছেন। একজন প্রজা, তাও আবার অবলা নারী! তার নিরাপত্তার চিন্তা করা কি অপরাধ?'

'না, তা অপরাধ নয়। কিন্তু তিনি সাক্ষাতের সময়টি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন রাতে! তুমি কি বলতে পারো, সাক্ষাতের সময় দিনে কেন করা হয়নি?'

চুপ করে রইলো বডিগার্ড, এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না।

এক মুখোশধারী বললো, 'আমরা যখন শুনতে পারলাম খতীব মাখদুমের কন্যাকে রাতের বেলা বাবার সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে সাইফুদ্দিন এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠাবে, তখনই আমাদের সন্দেহ হয়, এর মধ্যে কোন ঘাপলা আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার হেফাজতের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে নিলাম।

তুমি প্রথমেই তাকে নিয়ে ভুল রাস্তায় রওনা দিয়েছিলে। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের পিছু নিই। তুমি দু'তিনবার পিছনে যে পদধ্বনি শুনেছো, সেগুলো আমাদেরই ছিল। তুমি যাদের ঝোঁপ-ঝাড়ে খুঁজছিলে, সে লোকই আমরা। তুমি জানো না, আমরা দিনের আলোতেও কারো দৃষ্টিগোচর হই

না।'

'এটা তোমাদের অমূলক সন্দেহ।' বডিগার্ড বললো, 'আমি তাকে তার বাবার কাছেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমরা বস্তাবন্দী করে ধরে এনে মেয়েটির ওপর খুব অত্যাচার করেছো!'

'মিথ্যে কথা, তুমি ধোঁকা দিয়ে ওকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে!' এক মুখোশধারী তার গর্দানে তলোয়ার ঠেকিয়ে বললো, 'তুমি তাকে সাইফুদ্দিনের জন্য চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলে না? আমরা জানি, তোমার মালিক কেমন মানব দরদী লোক! যে ব্যক্তি খতীবের মত সৎ ও আল্লাহ্ ভীরু লোককে কারাগারে পাঠাতে পারে, রাতের অন্ধকারে সে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যে তার কন্যাকে ঘর থেকে বের করেছে, তা বুঝবো না, এতটা আহম্মক নই আমরা।

তুমি ভাল করেই জানো, খতীবকে কেন বন্দী করা হয়েছে। কিন্তু জানো না, খতীব একাই জেহাদের এই প্রেরণার ধারক নন, মুশালের অসংখ্য মুজাহিদের অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলছে জেহাদের আগুন।

তোমরা মনে করেছো, তিনি কারাগারে, অতএব তার মেয়ে একা। তোমাদের এ ধারনাও ভুল। আমি তোমাকে আরো জানিয়ে দিতে চাই, ইসলামের অগ্রযাত্রায় বাঁধা দিতে এলে আমরা সাইফুদ্দিনের সাধের গদি উল্টে দিতেও দ্বিধা করবো না।

তার পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমরা তাকে যে কোন মুহূর্তেই হত্যা করতে পারি। কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দিন

আইয়ুবী আমাদের কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, হাসান বিন সাব্বাহের ফেদাইনদের মত গোপনে চোরের মত কাউকে হত্যা করো না। তিনি গুপ্তহত্যা পছন্দ করেন না বলেই তোমরা এখনো বেঁচে আছো।'

'বুঝেছি, তোমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গুপ্তচর!' বডিগার্ড বললো।

'হ্যাঁ!' মুখোশধারী উত্তর দিল, 'আমরা তার কমাণ্ডো বাহিনী!'

সে তলোয়ারের মাথা তার গর্দানে একটু দাবিয়ে ধরলো, বডিগার্ড পিছাতে পিছাতে দেয়ালের সাথে গিয়ে ঠেকলো।

মুখোশধারী বললো, 'তুমি সাইফুদ্দিনের স্পেশাল বডিগার্ড, আর সব সময় তার সাথেই থাকো। তুমি তার সমস্ত গোপন তথ্য জানো। আমরা জানি, মেয়েদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে তুমি সাইফুদ্দিনের হাতে তুলে দাও।

বাঁচতে চাইলে বলো, সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সে কি কি পরিকল্পনা করেছে? যদি বলতে অস্বীকার করো, বা যদি বলো আমি তার কিছুই জানি না, তবে তোমার অবস্থা ঠিক তাই হবে, যেমন সাইফুদ্দিনের কারাগারে কয়েদীদের অবস্থা হয়।'

'যদি তোমরা প্রকৃতই সৈনিক হয়ে থাকো, তবে ভাল মতই জানো, বাদশা ও আমীরের কাছে একজন সাধারণ সৈনিকের কি মুল্য থাকে।' বডিগার্ড বললো, 'আমি কোন সেনাপতি বা কমাণ্ডার নই, তার পরিকল্পনার কথা আমি কেমন করে জানবো?'

এক মুখোশধারী তার মাথার ক্যাপ ফেলে দিয়ে মাথার চুল

ধরে জোরে টান মারলো। একদিকে কাত হয়ে পড়লো বডিগার্ড, অন্যজন তার পা ধরে এমন জোরে টান মারলো, সে সটান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

মুখোশধারীদের একজন তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে গেল এবং বুকে এমন জোরে লাথি মারতে লাগলো, বডিগার্ডের দাঁতে দাঁত বাড়ি খেলো। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে থামলো লোকটি।

একটু দম ফেলার ফুসরত পেতেই বডিগার্ড বলে উঠলো, 'বলবো, বলবো! আমি যা জানি সব তোমাদের বলে দেবো। আমাকে একটু সুযোগ দাও, উঠে বসতে দাও আমাকে!' তার কণ্ঠে কাতর অনুনয়।

তাকে ধরে বসানো হলো। মুখোশধারীদের একজন বললো, 'বলো, তুমি কি বলতে চাও? সাইফুদ্দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জানো সব খুলে বলো।'

বডিগার্ড বললো, 'সাইফুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'এটা কোন গোপন তথ্য হলো না।' এক মুখোশধারী বললো, 'আমরা জানতে চাচ্ছি, কবে ও কিভাবে সে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে? সে কি হলব ও হারানের সাথে ঐক্যজোটে যোগ দিচ্ছে, নাকি একাই যুদ্ধ করবে?'

'তিনি ওদের সাথে যোগ দেবেন।' বডিগার্ড উত্তরে বললো, 'কিন্তু তিনি এমন চালে যুদ্ধ করবেন, তার বাহিনীকে তিনি আলাদা রাখবেন এবং বিজয়ের পর তার বাহিনীর দখলে

যেটুকু এলাকা থাকবে তার কর্তৃত্ব তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করবেন। হলব ও হারানের লোকদের ওপর তার কোন ভরসা নেই, তিনি তার বাহিনীকে ওদের সাথে একাকার হতে দেবেন না।'

'তার সেনাপতিদের তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন?' এক মুখোশধারী জিজ্ঞেস করলো।

'তিনি পরিকল্পনা নিয়েছেন, সুলতান আইয়ুবীকে তিনি পাহাড়ী অঞ্চলেই অবরোধ করবেন।' বডিগার্ড উত্তর দিলো।

'কোন্ রাস্তা ধরে অভিযানে বেরুবে সেনাবাহিনী?'

'হিম্মাতের পর্বত শৃঙ্গ দিয়ে!'

'তিনি কি খৃস্টানদের সাথে এ ব্যাপারে কোন চুক্তি করেছেন?'

'হ্যাঁ, খৃস্টানদের সাথেও তার চুক্তি হয়েছে।' বডিগার্ড উত্তর দিল, 'তবে সাইফুদ্দিন তাদেরও প্রবঞ্চিত করবে বলে মনে হয়।'

'কোন খৃস্টান সৈন্য বা উপদেষ্টা কি তার ওখানে আছে?'

'হ্যাঁ, ক্রুসেডদের কয়েকজন কমাণ্ডার তার সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং দিচ্ছে।'

পাশের অন্য এক কামরায় সায়েকার সাথে কথা বলছিল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা বাহিনীর দুই লোক। খতীব ইবনুল মাখদুমের সাথে তাদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল।

দৃশ্যতঃ তিনি মুশালের খতীব হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন তাদের নেতা। তাঁরই নির্দেশনায় এ দলটি এখানে

গোয়েন্দা কাজে লিপ্ত ছিল এবং এদের প্রত্যেকেই কমাণ্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত।

এরাই ছিল সুলতান আইয়ুবীর চোখ ও কান। এদের মাধ্যমে দুশমনের প্রতিটি নড়াচড়া তিনি দেখতে পেতেন।

মুশাল থেকে সব সংবাদ ওরা দ্রুত সুলতান আইয়ুবীর সামরিক হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিত।

প্রকাশ্যে ওরা মুশালে চাকরী, দোকানদারী এবং এ ধরনের নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো।

খতীব কারাবন্দী হওয়ার পর থেকেই ওরা পালা করে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা খতীবের বাড়ীতে পাহারা দিতে শুরু করে।

যে মেয়েরা রাতে সায়েকাকে একা ভেবে তার বাড়ীতে থাকতে এসেছিল এবং রাতে ঘরের বাইরে এসে তারা যাদের ছায়া নড়াচড়া করতে দেখেছিল, সায়েকা তাদের জ্বীন বলে পরিচয় দিলেও ওরা ছিল আসলে এই কমাণ্ডো বাহিনীর সদস্য।

এরা সমস্ত সংবাদ রাখতো। সায়েকা যে তার বাবার সাথে দেখা করার অনুমতি নিতে সাইফুদ্দিনের কাছে গিয়েছিল এটা যেমন জানতো, তেমনি সায়েকা ফিরে আসার পর তার কাছ থেকে ওরা জেনেছিল, সাইফুদ্দিন তার সাথে অশালীন কথা বলেছে এবং তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে।

কমাণ্ডোরা বুঝতে পেরেছিল, রাতে সায়েকাকে বাড়ী থেকে বের করতে পারলে ওরা তাকে অন্য কোন দিকে নিয়ে গিয়ে গায়েব করে দেবে।

সুতরাং তারা পাঁচজন সন্ধ্যার পর সায়েকার বাড়ীর পাশে এসে ওঁৎ পেতে থাকে। সায়েকা সাইফুদ্দিনের বডিগার্ডের সাথে রওনা দিলে ওরা তাদের পিছু নেয়।

কিছুদূর এগুনোর পর তাদের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হলো। ওরা সময় নষ্ট না করে অত্যন্ত সাফল্যের সাথেই সায়েকাকে উদ্ধার করে এ গোপন আস্তানায় নিয়ে এসেছে।

বাড়তি লাভ হিসাবে পেয়েছে বডিগার্ডকে। কারণ এ বডিগার্ড সাইফুদ্দিনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী এবং সকল অপকর্মের দোসর। সাইফুদ্দিনের গোপন বিষয় সে যতটুকু জানে, দুনিয়ার আর কেউ ততটা জানে না।

তারা একের পর এক প্রশ্ন করে বডিগার্ডের কাছ থেকে আরো অনেক গোপন তথ্য আদায় করে নিলো।

তাদের কাছে সবচে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি মনে হলো, তাহলো, সাইফুদ্দিন তার সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক অংশ নিজের নেতৃত্বে রেখেছে, আর অপর অংশ তার ভাই আজীম উদ্দিনের নেতৃত্বে দিয়েছে।

সৈন্যদের এ দলটি মূল দলের সাথে না থেকে আলাদা থাকবে এবং প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে প্রয়োজনের সময় অতর্কিতে তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

আক্রমণের নেতৃত্ব দেবে সাইফুদ্দিন নিজে এবং তিনিই প্রথম আক্রমণ করবেন।

গার্ড আরো জানালো, 'হলব থেকে গুমাস্তগীন ও সাইফুদ্দিনের কাছে দূত এসেছে। তিন বাহিনীর সম্মিলিত কমাণ্ড গড়ে

তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছে খলিফা আল মালেকুস সালেহ। তারা খৃস্টানদের সহযোগিতা নেবে ঠিকই, কিন্তু তাদের ওপর বেশী ভরসা ও নির্ভর করবে না।'

বডিগার্ড এ সকল তথ্য অনর্গল বলে গেল শুধু মুক্তি পাওয়ার আশায়। কিন্তু আইয়ুবীর কমাণ্ডোরা তাকে মুক্তি দেয়ার পরিবর্তে তাকে তার রুমে আটকে রেখে সবাই এসে জড়ো হলো সায়েকার কামরায়।

সায়েকা বললো, 'এখন কি করতে চাও?'

কমাণ্ডোদের দলনেতা বললো, 'আপাততঃ তুমি এখানেই থাকো। এখন কোন মতেই তোমার বাড়ী যাওয়া উচিৎ হবে না।'

কমাণ্ডোরা সায়েকাকে এবং বডিগার্ডকে যার যার কামরায় রেখে বাইরে দিয়ে দরজা আটকে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

হলব ও হারান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে খৃস্টানদের সামরিক হেড কোয়ার্টার। ওরা যুদ্ধ নয়, কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা তৎপরতাই চালাতো বেশী। হেড কোয়ার্টারের ইনচার্জ রাশভারী লোক হলেও কূটনৈতিক তৎপরতায় ছিল অসম্ভব দক্ষ। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করার পরিবর্তে তার মূল টার্গেট ছিল, মুসলিম বিদ্রোহী গ্রুপ ও বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদেরকে উস্কে দেয়া।

সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কিভাবে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও

সহযোগিতা করা যায়, বসে বসে সেই পরিকল্পনাই তৈরি করছিল সে।

সে হিসেব করে দেখলো, মুসলমান বড় বড় আমীর ও উর্ধতন সামরিক অফিসারদের একটা বড় গ্রুপকে এরই মধ্যে কব্জা করা গেছে। তাদের সহযোগিতার জন্য তাদের কাছে সামরিক উপদেষ্টাও পাঠানো হয়েছে।

কোথাও কোথাও তার পাঠানো সামরিক অফিসাররা ওখানকার মুসলিম সৈন্যদের সামরিক এবং গেরিলা ট্রেনিং দিচ্ছে।

মুসলমানদের ইসলামী চেতনা বিনষ্টের জন্য কয়েকজন খৃস্টান পণ্ডিতকে ভূয়া আলেম সাজিয়ে মুসলিম এলাকায় ধর্মীয় ফেতনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমীরদের বিলাসিতা ও আমোদ-স্ফূর্তির সব রকমের উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে।

খৃস্টান গোয়েন্দারা বিভিন্ন আমীরের দরবারে নানা ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। তাদের মাধ্যমে আমীরদের তৎপরতা এবং স্থানীয় জনগণের আবেগ উচ্ছ্বাস সম্পর্কে প্রতিটি খবর খৃস্টান হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে যাচ্ছে।

হারান থেকে গুমাস্তগীনের খৃস্টান উপদেষ্টার পাঠানো সংবাদ বাহক সেই সামরিক হেড কোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছলো।

সে যখন ওখানে পৌঁছে তখন খৃস্টানদের দুই প্রসিদ্ধ জেনারেল এবং শাসক সম্রাট রিমাণ্ড ও রিজন্যাল্ট, সেখানে বৈঠক

করছিল।

রিমাণ্ড সম্প্রতি সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর হাতে মার খেয়ে যুদ্ধ না করেই সুকৌশলে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করছিলো সম্রাট রিজন্যাল্টের কাছে।

সম্রাট রিজন্যাল্টের মনেও থেকে থেকে বেদনাদায়ক এক স্মৃতি বার বার ভেসে উঠছিল। মনে পড়ছিল সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর কথা।

সুলতান আইয়ুবীর কবল থেকে রিমাণ্ড তো ফিরে আসতে পেরেছে, কিন্তু নূরুদ্দিন জঙ্গী! জঙ্গী তো আমাকে যুদ্ধের ময়দানে থেকে আমার বাহিনীসহ ধরে নিয়ে তার কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলো!

আমাদের ভাগ্য ভাল যে, তিনি আমাদেরকে হারান দুর্গে রেখেছিলেন এবং হারান দূর্গের অধিপতি গুমাস্তগীনের উচ্চাভিলাষ তাকে গাদ্দার বানাতে পেরেছিল।

বাগদাদের খেলাফতের আওতায় সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর অধীনে এ দূর্গের অধিনায়ক ছিল গুমাস্তগীন। নূরুদ্দিন জঙ্গীর ওফাতের পর গুমাস্তগীন নিজেকে স্বাধীন শাসক বলে ঘোষণা করে।

নিজেকে শাসক হিসাবে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সে খৃস্টানদের বন্ধুত্ব কামনা করে এবং এই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ করার আশায় সম্রাট রিজন্যাল্টসহ সমস্ত খৃস্টান কয়েদীকে সে মুক্ত করে দেয়।

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর ইচ্ছা ছিল, রিজন্যাল্টের মুক্তির

বিনিময়ে খৃস্টানদের সাথে সমস্ত অমীমাংসিত বিষয়ে সন্তোষজনক ফয়সালা করে নেবেন। কিন্তু জঙ্গীর মৃত্যু সব কিছু বানচাল করে দিল। তার অধীনস্ত আমীররা বিলাসিতা ও ক্ষমতালোভী হয়ে উঠার কারণে জঙ্গীর সব পরিকল্পনা উলট-পালট হয়ে গেল।

খৃস্টানরা ইসলামী সাম্রাজ্যের মৌলিক ভিত্তি চুরমার করে দিয়ে ক্ষমতালোভী আমীরদেরকে আঙুলের ইশারায় নাচাতে লাগলো। ইসলামী দুনিয়ায় নেমে এলো দুর্যোগের ঘনঘটা।

মুসলিম আমীরদের কাছে যেসব খৃস্টান উপদেষ্টা থাকতো তাদের মূল কাজ ছিল গোয়েন্দাগিরি করা। তারা ছিল মূলত: ক্রুসেড বাহিনীর ভিআইপি চর।

হারান থেকে সংবাদ বাহক খৃস্টান হেড কোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছলে সম্রাট রিমাণ্ড ও রিজন্যাল্ট তাকে ভিতরে ডেকে নিল। বললো, 'বলো, কি খবর নিয়ে এসেছো?'

সে হারানের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করে বললো, 'হলব থেকে আল-মালেকুস সালেহ গুমাস্তগীন ও সাইফুদ্দিনকে যে উপঢৌকন পাঠায় তার সাথে ছিল খলিফার গোপন চিঠি। সে চিঠির মূল বক্তব্য হলো, 'তারা তাদের সেনাবাহিনীকে সম্মিলিত কমাণ্ডে এনে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়তে চায়।'

'খুবই খুশীর খবর! আইয়ুবী পরাজিত হলে তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি করে মরুক আর ক্ষমতায় যাক, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।'

'কিন্তু সেখানে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, গুমাস্তগীনের দুই জাদরেল সেনাপতি এখন তারই কারাগারে বন্দী।'

'স্ট্রেঞ্জ! কেন, কি অপরাধে তাদের বন্দী করা হয়েছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন দুই সম্রাট।

'সে এক অদ্ভুত ঘটনা। এ দুই সেনাপতি সহোদর দু'ভাই। খলিফার দরবার থেকে যখন উপহার সামগ্রী ও চিঠি হারানে এসে পৌঁছে তখন গুমাস্তগীন আরাম করছিলেন। উপহার সামগ্রীসহ দূত প্রধান সেনাপতি শামস বখতের কাছে রিপোর্ট করে। ওখানে তখন তার ছোট ভাই সেনাপতি সাদ বখতও উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য উপঢৌকনের সাথে দু'জন সদ্য যৌবনা যুবতীও পাঠিয়েছিলেন খলিফা আল মালেকুস সালেহ।

কাজী ইবনুল খাশিবের চরিত্র তো আপনাদের ভালই জানা আছে। তিনি ওখানে গিয়ে মেয়ে দুটিকে তার হাতে তুলে দেয়ার দাবী জানালে ওরা আপত্তি জানায়। ঝগড়ার এক পর্যায়ে ওরা দু'ভাই মিলে কাজীকে হত্যা করে। তারপর মেয়ে দু'টিকে ওরা মুক্তি দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়।

এ ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে তারা স্বীকার করে, তারা দু'জনই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমর্থক। গুমাস্তগীনের সেনাপতি হওয়ার পরও তাদের আনুগত্য ছিল আইয়ুবীর প্রতি।

এ দুই সেনাপতি সুদূর হিন্দুস্তান থেকে এসেছে। ইচ্ছে করলে ওরা পালিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু কেন যে যায়নি, আমাদের

কাছে সেটা এখনো এক রহস্য। গুমাস্তগীন দু'জনকেই কারাগারে আটকে রেখেছে।'

'কি অবাক করা কথা বলছো তুমি! মনে হচ্ছে রূপকথার গল্প শোনাচ্ছো?'

'না, না, এটা কোন গল্প নয় এবং ঘটনা এখানেই শেষও নয়! সেখানে আরো অবাক করা ঘটনা ঘটে গেছে। যেদিন এ ঘটনা ঘটে তার আগের রাত।

গুমাস্তগীনের মহলে জমজমাট আসর চলছিল। আসরে উপস্থিত ছিল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সামরিক অফিসার ও আমাদের সকল উপদেষ্টা এবং কমাণ্ডাররা।

গুমাস্তগীনের মহলেরই এক মেয়ে সে রাতে আমাদের এক খৃস্টান কমাণ্ডারকে গোপনে মাহফিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাকে সুকৌশলে হত্যা করে।

ঘটনা জানাজানি হওয়ার আগেই সে মেয়ে এবং গুমাস্তগীনের এক বিশ্বস্ত গার্ড রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। তারা কোথায় পালিয়েছে এখনো তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তবে সবারই ধারনা, তারা সুলতান সালাহউদ্দিনের কাছে চলে গেছে।'

এতবড় দুঃসংবাদ দুই সম্রাটের কাউকেই তেমন বিচলিত করতে পারলো না। তারা বরং এ খবরে বেশ মজাই পেলো।

রিমাণ্ড হেসে বললো, 'এই মুসলমান জাতটা এমন যৌনপ্রিয় যে, কি আর বলবো! তাদের আমীর-ওমরা ও ক্ষমতাধরদের এই এক অস্ত্র দিয়েই ঘায়েল করা যায়। নইলে গুমাস্তগীনের

মত ক্ষমতাধর দুর্গাধিপতির কাজীই বা মরতে যাবে কেনো, আর তার দুই বিশ্বস্ত সেনাপতিই বা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পক্ষে চলে যাবে কেন? আমার বিশ্বাস, ঐ দুই সুন্দরী আইয়ুবীর গোয়েন্দা ছিল এবং তাদের মোহে পড়েই কাজীকে হত্যা করে মেয়ে দু'টিকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল তারা। মেয়ে দু'জনকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তারা হয়তো গুমাস্তগীনের সোনাদানা হাতিয়ে নেয়ার জন্য ফিরে এসেছিল, পরে আর যেতে পারেনি, ধরা পড়ে গেছে। এ ভুলের মাশুল দিতে গিয়েই তারা এখন গুমাস্তগীনের কারাগারে বন্দী হয়ে আছে।'

'আমার মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। গুমাস্তগীনের অন্দর মহলের যে মেয়েটি নিখোঁজ হয়েছে, হয়তো তার সাথে গার্ডের প্রেম ছিল। পালাবার সময় আমাদের কমাণ্ডারের চোখে পড়ে যাওয়ায় তাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে তারা।'

'সত্যি, মুসলিম আমীর ওমরা ও দুর্গাধিপতিদের অন্দর মহলগুলো এক রহস্যময় দুনিয়া। ওদের সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এ জাতি বিলাসিতা ও আমোদ-স্ফূর্তি করতে করতেই একদিন বিলীন হয়ে যাবে।'

দুই সম্রাট যখন কথা বলছিল, দুর্গের বিচক্ষণ কমাণ্ডার চুপ করে শুনছিল ওদের কথা। এবার সে মুখ খুললো, 'আমি বিনয়ের সাথে দু'টি কথা বলতে চাই। আপনারা বলেছেন, উপঢৌকন হিসেব প্রাপ্ত মেয়েদেরকে হারান থেকে ভাগিয়ে

নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, এ কথা আমি মেনে নিতে পারছি না।

আমি দীর্ঘদিন ধরে গোয়েন্দা বিভাগের কাজ পরিচালনা করে আসছি। শত্রুদের সামরিক গোপন তৎপরতার তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও আমার গোয়েন্দারা আরো কিছু কাজ করে যাচ্ছে। শত্রুদের সামরিক কর্তা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ক্রিয়া-কলাপ, তাদের সামরিক কৌশল এসব সম্পর্কেও ওরা নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে হেড কোয়ার্টারে পাঠাচ্ছে।

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, নারীর নেশা ও মদের নেশার ক্ষেত্রে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যেমন পাথর, তেমনি কঠিন তার পদস্থ সামরিক অফিসাররা।

এ কারণেই বার বার বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করেও তাকে হত্যা করা যায়নি। সুন্দরীদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টাও বার বার ব্যর্থ হয়েছে।

এ ধরনের স্বভাব প্রকৃতির মানুষ আবেগের বশবর্তী হয় না। তারা সংকল্পে অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ় হয়। তারা যে মিশনে নামে সে উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত তারা নিরলস কাজ করে যায়।

আমাদের শত্রু হলেও এ সত্য আমি অস্বীকার করতে পারবো না, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মধ্যে এ গুণ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এ জন্যই তিনি তার প্রতিটি পদক্ষেপে সফলতা ছিনিয়ে নিতে পারেন।

সব সময়ই তাঁর মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করে। তিনি এমন

বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং এমন অবিশ্বাস্য কাজ করতে পারেন, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ফলে আমাদের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়।

আমি তাঁর সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে বুঝেছি, তিনি আত্ম দমনে অসম্ভব পারদর্শী এবং নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। পার্থিব লোভ লালসার উর্ধে তার জীবন।

তিনি তার অনুসারী এবং সৈনিকদেরও এই সুন্দর ব্যবহার শিক্ষা দিতে পেরেছেন। তিনি তাদের মনে এমন ঈমানী চেতনা ও জযবা তৈরী করতে পেরেছেন, মরুভূমিতে বসবাসকারী সৈন্যরা এই পাহাড়ী অঞ্চলে কঠিন বরফ ও তুষার ঝড়ের মধ্যেও পাহাড়ের মতই অটল হয়ে যুদ্ধ করতে পারছে। তাদের ঈমানী চেতনা দৃঢ় না হলে ওখানে বসে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, সেখানে টিকে থাকাই অসম্ভব হতো ওদের পক্ষে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের সৈন্যদের মধ্যে এমন দৃঢ় মনোবল তৈরী করতে না পারবো, ততক্ষণ আমাদের পক্ষে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না।'

একটু থামলো সে। সম্রাট রিমাণ্ড তার কথায় বিরক্ত না হয়ে বললো, 'আর দ্বিতীয় বিষয়টি কি?'

'দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, মুসলমানদের মধ্যে যে সব আমীর ও উজির নারী আসক্ত হয়েছে সেটা আমাদের মিশনের কৃতিত্ব। ইহুদী পণ্ডিতরা শত শত বছরের গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে

এসেছে, মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য জরুরী হচ্ছে তাদের ঈমানী জযবা ও চারিত্রিক শক্তি নষ্ট করা। ক্ষমতার লোভ ও নারী এ কাজে সবচে সফল অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আর যেখানে এ দুটো অস্ত্র কাজ করবে না, সেখানে ধর্মীয় বিভেদ ও তাদের ফেরকাগত সমস্যাকে উস্কে দিয়ে ফায়দা হাসিল করতে হবে।

ইহুদীদের এই আবিষ্কার পরীক্ষিত ও অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়েছে। তাদের দেয়া প্রেসকিপশন অনুযায়ী এ ওষুধ প্রয়োগ করে আমরাও বেশ সফলতা পেয়েছি। এ সাফল্যের মূল কৃতিত্ব সেই ইহুদী পণ্ডিতদের। আমরা নারী ও সম্পদের মোহ সৃষ্টি করে বহু মুসলমান নেতা ও যোদ্ধাকে বিকল করতে পেরেছি।

তাদেরকে নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে দুর্বল করার জন্য চঞ্চলা সুন্দরী যুবতীদেরকে আমরা যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দিয়েই তাদের কাছে পাঠিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, এখন ওরাও আমাদের পথ ধরেছে। আমাদের অনুকরণে নিজেরাই নিজেদের কাছে উপহার হিসেবে নারী পাঠাতে শুরু করেছে।'

'এ জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আমরা ঠিক পথই ধরেছি।'

রিজন্যাল্ট বললেন, 'এই জাতি নিজেদের হাতেই নিজেরা শেষ হয়ে যাবে। আমার বন্ধু রিমাণ্ডকে স্বসৈন্যে পিছু হটাতে সমর্থ হয়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী হয়ত উল্লসিত, কিন্তু তার তো জানা নেই, রিমাণ্ড তার চোখের সামনে থেকে সরে গেলেও

যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে যায়নি।
মুসলিম জাতির বুকের ওপর সে নতুন ময়দান তৈরী করেছে। এ ময়দানে যে যত নড়াচড়া করুক, পাঁজড়ের হাড় ভাঙবে শুধু মুসলমানদের।
এখন আর আমাদের সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, এখন আমরা গোপন সেক্টরে লড়াই করবো, মুজাহিদের তলোয়ার যার মোকাবেলা করতে পারবে না। এ সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে জিততে হবে আমাদের। আর এ লড়াইয়ের বিজয়ই আমাদেরকে দিতে পারে স্থায়ী সাফল্যের গ্যারান্টি।'
'এই মিশনটিই এখন খুব জোরদার করা প্রয়োজন।' হারান থেকে ফিরে আসা সংবাদ বাহক নিজেও একজন অভিজ্ঞ সামরিক ও গোয়েন্দা অফিসার। তিনি বললেন, 'আমি আপনাদেরকে গুমাস্তগীনের আভ্যন্তরীণ যে ঘটনাবলী শুনিয়েছি এতেই প্রমাণিত হয়, সেখানে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা ও কমাণ্ডোরা শুধু উপস্থিতই নয়, বরং গুমাস্তগীনের মহলের মধ্যেও তাঁর কমাণ্ডোরা পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে আমাদের সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার।'
'গুমাস্তগীন, সাইফুদ্দিন ও আল মালেকুস সালেহের ঐক্যবদ্ধ সামরিক জোটের বিরুদ্ধে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা ও কমাণ্ডো বাহিনী যদি কোন পদক্ষেপ নেয়, তাতে আমাদের কি ক্ষতি? আমরা কেন ওদের নিরাপদ রাখতে যাবো?' বৈঠকে উপস্থিত অন্য এক জেনারেল বললো, 'আমরা তো তাদের ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করতে চাই। সে ধ্বংস আমাদের দ্বারাই

হোক অথবা তাদের কোন ভাইয়ের দ্বারাই হোক।'

তিনি আরো বললেন, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও কোন মুসলমানই আমাদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। যদি কেউ এমনটি মনে করেন, তবে বুঝতে হবে তিনি প্রকৃত ক্রুসেডপন্থী নন অথবা কেন এ ক্রুসেড চলছে তার মর্ম তিনি বুঝতে পারছেন না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের শত্রুতা নূরুদ্দিন জঙ্গী বা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে নয়। আমাদের লড়াই মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামের বিরুদ্ধে।' বললেন সম্রাট রিমাণ্ড।

জেনারেল বললো, 'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে সামনে পেলে আমি তাকে স্যালুট জানাবো। তিনি কেবল বীর যোদ্ধাই নন, অসম্ভব রণকুশলী এক সেনাপতি। তার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই, সংঘাতটা হলো আদর্শিক।

প্রতিটি মুসলমান আমাদের শত্রু, প্রতিটি মুজাহিদ আমাদের প্রতিপক্ষ। যারা ইসলামের সুরক্ষা ও প্রসার চায় তারাই ক্রুশের দুশমন। আমাদের সংঘাত এই ক্রুশের দুশমনদের সাথে।'

সম্রাট রিজন্যাল্ট বললেন, 'একদিন আমরা সবাই মারা যাবো, সালাহউদ্দিনও চিরকাল বেঁচে থাকবে না। কিন্তু আমাদের এ যুদ্ধ শেষ হবে না, এ লড়াই চলতেই থাকবে।

এ লড়াইয়ের অংশ হিসাবেই আমরা মুসলমানদের মধ্যে নানা কুসংস্কার সৃষ্টির চেষ্টা করছি, যা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে

ইসলামের মূল চেতনা, চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে রাখবে। আমাদের এ পদ্ধতি কার্যকর হলে মুসলমানরা তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ ও সভ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

ওরা যদি নিজেদের সাংস্কৃতিক আইডেন্টিটি হারিয়ে নিজেদের জীবনধারা আমাদের সংস্কৃতির রঙে রঙ্গিন করে তোলে, তবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের তো আর কোন প্রয়োজন থাকে না!'

তিনি আরো বললেন, 'আমরা সে যুগে হয়তো বেঁচে থাকবো না, দেখতেও পাবো না এর সাফল্য। কিন্তু প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, যদি আমরা আমাদের এই মিশন চালু রাখতে পারি, তবে সে দিন বেশী দূরে নয়, ইসলাম শুধু নামেই বেঁচে থাকবে, কিন্তু প্রকৃত ইসলাম কোথাও থাকবে না। ইসলামের প্রেতাত্মা চারদিকে কেঁদে বেড়াবে।

মুসলমান নামে শুধু মুসলমান থাকবে। তাদের কোন স্বাধীন রাজ্য থাকলেও তা হবে পাপ ও জঞ্জালের আখড়া। কারণ ইহুদী ও খৃস্টান বুদ্ধিজীবীরা সম্মিলিতভাবে তাদের মধ্যে পাপের বীজ বপণ করে যাচ্ছে। তাদের পূণ্যের ঘর শূন্য করে আমরা তা পাপ দিয়ে ভরে দেবো।'

হারান থেকে আগত অফিসার বললো, 'কিন্তু আমি এসেছিলাম অন্য এক আবেদন নিয়ে। গুমাস্তগীন এখনই আইয়ুবীকে আক্রমণ করতে চায় এবং এ জন্য সে আমাদের সাহায্য চেয়েছে। এ পয়গাম দিয়েই আমাকে পাঠিয়েছে সে। এ ব্যাপারে তাকে গিয়ে কি বলবো?'

ওদের মধ্যে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা হলো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, গুমাস্তগীনকে বাস্তবে কোন সামরিক সাহায্য দেয়া হবে না, তবে তাকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে রাখতে হবে।

তাদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে, তারা তিন বাহিনী তিন দিক থেকে আক্রমণ করে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আর রিস্তান পাহাড়ে অবরোধ করলে, আমরা আমাদের সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবো।

সম্রাট রিজন্যাল্ট বললেন, 'কিন্তু বাস্তবে আমরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবো। দূর থেকে তাকিয়ে দেখবো সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও সম্মিলিত বাহিনীর ভয়াভহ হত্যাযজ্ঞ। আর রিস্তান পাহাড়ের বরফগলা পানি আইয়ুবীর সৈন্যদের রক্তে লাল হয়ে গড়িয়ে নামবে নিচের দিকে, আর পাদদেশে তিনি দিকে তিন বাহিনী আইয়ুবীর সৈন্যদের তোপের মুখে যখন মুখ থুবড়ে পড়বে, আমাদের কাজ হবে তখন, কে পরাজিত হয় তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখা।

এরপর শুরু হবে আসল খেলা। ক্লান্ত-শ্রান্ত বিজয়ী দলের ওপর আঘাত হানবো আমরা। এখানে সম্রাট রিমাণ্ড আছেন। আমি অনুরোধ করবো, তিনিও এই বিজয় অভিযানে অংশ নিয়ে গৌরবের হকদার হবেন।'

'নিশ্চয়ই!' সম্রাট রিমাণ্ড সানন্দে এই প্রস্তাব কবুল করে বললেন, 'এ ধরনের একটি সুযোগেরই তো অপেক্ষায় ছিলাম আমি। দোয়া করুন, প্রভু যিশু যেন এবার আমাদের সহায়

হোন।'
এ বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, হলব, হারান ও মুশালের বাহিনীর জন্য সামরিক উপদেষ্টা ছাড়াও তাদের আশ্বস্ত করার জন্য তীর-ধনুক ও গোলা-বারুদের একটি করে চালান পাঠিয়ে দেয়া হবে তিন বাহিনীর কাছেই। এ ছাড়া প্রত্যেক বাহিনীর জন্য পাঠানো হবে দু'শো করে ঘোড়া।
এক জেনারেল বলে উঠলো, 'তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, পাঠানো ঘোড়াগুলো যেন আমাদের সৈন্য বাহিনীর পরিত্যাক্ত ঘোড়া হয়।'
'হ্যাঁ, যেসব ঘোড়া আমাদের কোন কাজে আসবে না, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে সুস্থ্ সবল, সেগুলোই পাঠানো হবে।'
রিজন্যাল্ট বললেন, 'সেই সঙ্গে তাদেরকে বিলাসিতা ও আনন্দ-স্ফূর্তির সামগ্রীও পাঠাতে হবে আর বলতে হবে, যখনই তাদের কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তারা যেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে, তাদের সে প্রয়োজন আমরাই পূরণ করে দেবো।'
অফিসার কিছুটা অবাক হয়ে বললো, 'তাদের অস্ত্রের জোগান আমরা দিতে যাবো কেন?'
'আহাম্মক, এটাও বুঝো না? তখন তারা নিজেরা অস্ত্র তৈরীর কষ্টে না গিয়ে আমাদের ওপর নির্ভর করবে। আর এভাবেই তারা আমাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। শেষে এমন অবস্থা হবে, তারা অস্ত্রের জন্যও চাতকের মত আমাদের দিকেই চেয়ে থাকবে। এ সাহায্য সহযোগিতার জোগান দেবে

আমাদের উপদেষ্টারা। এভাবেই আমরা তাদের অভিভাবক ও প্রভু সেজে বসবো!'

অন্য এক কমাণ্ডার বললো, 'এ সাহায্য পাঠানোর আগে সালাহউদ্দিনকে হত্যা করার জন্য শেখ মান্নানের যে নয়জন ফেদাইন ঘাতককে পাঠানো হয়েছে তাদের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করলে হতো না! তারা তো শপথ করে বলেছে, আইয়ুবীকে হত্যা না করে ওরা কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসবে না।'

'তাদের ওপর ভরসা করে লাভ নেই। যুদ্ধ লাগলে যে ব্যাপক মুসলিম নিধন হবে, কেবল আইয়ুবীকে হত্যা করে সে সাফল্য আমরা কিছুতেই অর্জন করতে পারবো না। ফেদাইনদের কাজ ফেদাইনরা করুক, এদিকে যুদ্ধ শুরুর কাজও অব্যাহত থাকুক।' বললেন রিজন্যাল্ট।

সে দিনই দু'শো ঘোড়া, হাজার হাজার ধনুক ও তীর এবং প্রচুর গোলা বারুদের বহর নিয়ে হারানের দিকে যাত্রা করলো অফিসার।

রওনা করার সময় ওকে বলে দেয়া হলো, 'গুমাস্তগীনকে বলবে, এমন বিশাল আকারের সাহায্য আমরা বরাবর পাঠাতে থাকবো। সম্মিলিত বাহিনী যেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর আক্রমণ চালাতে বিলম্ব না করে।'

একই সাথে হলব এবং মুশালেও এ প্রস্তাব এবং সাহায্য সামগ্রী পাঠিয়ে দেয়া হলো।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তার হেড কোয়ার্টারে বসেছিলেন। আনতানুস ও ফাতেমা গিয়ে পৌছলো সেখানে।

ফাতেমার জীবনে এ ছিল এক ব্যতিক্রমী সফর। গুমাস্তগীনের অন্দর মহলের সুখ সাচ্ছন্দ্য পেছনে ফেলে এক খৃস্টান কমাণ্ডারকে হত্যার অপরাধে পালাতে হয়েছে তাকে। ভাগ্যই তাকে গুমাস্তগীনের গার্ড বাহিনীর সদস্য, সুলতান আইয়ুবীর বিশ্বস্ত গোয়েন্দা আনতানুসের সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছে।

আনতানুস গোয়েন্দা হিসাবে খারাপ ছিল না, কিন্তু অতি আবেগ তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারও ভাগ্য ভাল, ধরা পড়ার পর সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখতের আন্তরিক সহযোগিতা ও কৌশলের কারণে ফাতেমাকে নিয়ে সে পালাতে সক্ষম হয়।

সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতানের কাছে গেলেন।

আনতানুস সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে সুলতানকে বললো। কিন্তু তার কথা শুনে সুলতান আইয়ুবী খুশী হতে পারলেন না।

তার এই অতি উৎসাহী ও আবেগ তাড়িত কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে শামস বখত এ ব্যাপারে তাকে সাবধান করার পরও তার সতর্ক না হওয়াটা মারাত্মক অপরাধ। গোয়েন্দা বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী এ জন্য তার কঠোর সাজা হতে পারতো।

কিন্তু একটি কারণে সুলতান তাকে ক্ষমা করে দিলেন। যে কৌশলে সে গুমাস্তগীনের দেহরক্ষী হতে পেরেছিল, তাতে তার দক্ষতা ও নৈপূণ্য ফুটে উঠে। একজন দুর্গ প্রধানের

বিশ্বস্ততা অর্জন সহজ ব্যাপার নয়, নিঃসন্দেহে এটা একটা প্রশংসনীয় বিষয়।

তাছাড়া ফাতেমার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে গুমাস্তগীনের অন্দর মহলে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছে।

একজন ঝানু গোয়েন্দা হওয়ার জন্য যে বুদ্ধি, সাহস ও কৌশল দরকার, সবই আছে এ যুবকের। কেবল যদি সে তার আবেগের ঘোড়ার লাগামটা আরেকটু টেনে ধরতে পারে তবে এ যুবক ভবিষ্যতে গোয়েন্দা জগতে নাম করতে পারবে। এদিকটি বিবেচনা করেই সুলতান আইয়ুবী আনতানুসের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

তাকে আদেশ দিলেন, 'তোমাকে আবার সেনাবাহিনীতে ফিরে আসতে হবে। কারণ গোয়েন্দাগিরি করার মত সংহত আবেগ এখনও তোমার তৈরী হয়নি। কি করে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং সামরিক শৃংখলা বজায় রাখতে হয় আয়ত্ব করতে পারোনি তুমি।'

ফাতেমাকে বললেন, 'আর তোমার এ যুদ্ধের ময়দানে থাকার দরকার নেই। তুমি দামেশকে চলে যাও। আমি তোমার দামেশক যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'আমি আনতানুসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই।' ফাতেমা বললো।

'হ্যাঁ! তাই হবে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান দামেশকেই হবে। যুদ্ধের ময়দান গাজী ও শহীদ হওয়ার জায়গা। এখানে বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।'

'সুলতানে মুহতারাম!' আনতানুস বললো, 'আমি আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছি, সে কারণে আমি স্থির করেছি, যতক্ষণ আপনাকে সন্তুষ্ট করতে না পারবো ততক্ষণ আমি বিয়ে করবো না।' সে ফাতেমাকে বললো, 'তুমি সুলতানের আদেশ মতো দামেশকে চলে যাও। সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। আল্লাহর মর্জি হলে তোমার বিয়ে আমার সাথেই হবে।'

সে আবার সুলতান আইয়ুবীর দিকে ফিরে বললো, 'মুহতারাম সুলতান! আমি আপনার কমাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দিতে চাই। অতর্কিতে দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার প্রশিক্ষণ নেয়া আছে আমার।'

তাকে কমাণ্ডো দলে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হলে আনতানুস সেখান থেকে এমনভাবে বিদায় হলো যে, সে একবারও আর ফাতেমার দিকে ফিরে তাকালো না।

পরের দিন ফাতেমাকে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তার সাথে পাঠানো হলো গুমাস্তগীনের দরবারে আল মালেকুস সালেহ প্রেরিত মেয়ে দু'টিকে। তাদের সঙ্গী হলো সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখতের পাঠানো তাদের সঙ্গী সেই দুই ব্যক্তি।

তারা সুলতান আইয়ুবীকে হারানে কি ঘটেছে তা সবিস্তারে বললেও তাদের জানা ছিল না, তাদের দুই প্রিয় সেনাপতি ধরা পড়েছে এবং তারা এখন গুমাস্তগীনের কারাগারে বন্দী।

মেয়ে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিল সুলতানকে। তারা খৃস্টানদের

পরিকল্পনা, খলিফা আল মালেকুস সালেহের দরবারে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কি তৎপরতা চলছে তার বিশদ বিবরণ তুলে ধরলো সুলতানের কাছে।

'আপনি কি জানেন, ফিলিস্তিনের মুসলমানরা আপনার পথ পানে চেয়ে আছে?' একটি মেয়ে বললো, 'সেখানে মেয়েরা আপনার নামে গান গায়। মসজিদে আপনার সাফল্যের জন্য দোয়া করা হয়।'

তারা খৃস্টান অধিকৃত এলাকার মুসলমানদের দুর্দশার মর্মন্তুদ বর্ণনা দিয়ে বললো, 'খৃস্টানরা তাদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। তাদের জন্য দেশটাকে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলেছে।'

'সেখানে আমাদের সম্ভ্রমই শুধু বিপন্ন নয়, আমাদের শিশুদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন।' অন্য মেয়েটি বললো।

'আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য আমি শুধু ওদেরই দায়ী করবো না, আমি বলবো, আমাদের জাতির মান সম্মান ও জাতীয় চেতনা বিনষ্ট করছে আমাদের আমীর ওমরাগণ! আমি আমাদের আমীরেরই প্রেরিত উপহার!

আমি তাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছিলাম, আমরা আপনার জাত বোন, আপনার মতই আরেক মুসলমানের কন্যা। কিন্তু তারা একটি কথাও শুনলো না। তারা আমাদেরকে বাজারের পণ্য সামগ্রীর মত একে অন্যের কাছে উপহার পাঠাতে লাগলো।' মেয়েটি বললো, 'ফিলিস্তিনের মুক্তির পথেও তারাই আসল বাঁধা।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি ফিলিস্তিন পৌছার জন্যই তো বের হয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভাইয়েরাই আমার রাস্তা বন্ধ করে বসে আছে!'

তিনি আরো বললেন, 'তোমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ! এখানে যারা আছে তারা সবাই তোমাদের ভাই। এখানে আরো একটি মেয়ে এসেছে। তাকে দামেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরাও তার সঙ্গে দামেশকে চলে যাও।'

'আমি আমার ইজ্জত লুণ্ঠনের বদলা নেবো!' এক মেয়ে বললো, 'আপনার কাছে আমার আকুল আবেদন, দয়া করে আমাকে দামেশকে পাঠাবেন না। আমাকে এখানেই রেখে দিন আর আমাকে কোন কাজ দিন। কোন হেরেমে কিংবা বাড়ীতে গিয়ে দুঃসহ স্মৃতির দহনে ধুকে ধুকে মরতে চাই না আমি।'

'এখনও আমরা বেঁচে আছি!' সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'তুমি দামেশকে চলে যাও। সেখানে তোমাকে কেউ অবজ্ঞা বা অসম্মান করবে না। সেখানে মেয়েরা ইসলামের স্বপক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তাদের সে কাজ ও দোয়া আমাদের অগ্রযাত্রায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে।

ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন কেবল সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব। প্রয়োজন ইসলামের সঠিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। তুমি সেখানে চলে যাও, কোন না কোন দায়িত্ব তুমি অবশ্যই পেয়ে যাবে।'

মেয়েরা বিদায় নিল সুলতানের কাছ থেকে। আইয়ুবী বেদনামাখা চোখে তাকিয়ে রইলেন ওদের গমন পথের দিকে।
মেয়েরা বিদায় হয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবীর কানে তখনো বাজছে মেয়েদের বলে যাওয়া করুণ কাহিনীর অসহ্য বিলাপ ধ্বনি। মেয়ে দুটির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ তিনি যেন চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছেন!
বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলেন এদিক-ওদিক।
হাসান বিন আবদুল্লাহ বেদনার্ত চোখে তাকিয়েছিলেন সুলতানের দিকে। সুলতানের কষ্ট ও মর্মযাতনা তিনি বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু চুপ করে দেখে যাওয়া ছাড়া তার আর করার কিছুই ছিল না।
এক সময় পায়চারী থামিয়ে হাসানের কাছে এসে বললেন, 'বসো হাসান। বলো কি বলতে চাও?'
উভয়ে মুখোমুখি বসলেন। সুলতান আইয়ুবীর দিকে তাকিয়ে হাসান বললো, 'মিশর থেকে এখনও কোন সাহায্য এসে পৌঁছলো না! যদি তিনটি বাহিনী এক সাথে আক্রমণ করে বসে তবে আমাদের জন্য বিপদ হয়ে যাবে। মনে হয়, শত্রুরা জানে না, আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম, আর আমরা সাহায্যের আশায় বসে আছি!'
'আল্লাহই মুমীনদের মুহাফিজ। এই কঠিন শীতে বরফের রাজ্যে পাহাড় চূড়ায় কি জন্য বসে আছি আমরা? একমাত্র

তার দ্বীনের বিজয়ের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তার মুখলেস বান্দাদের কখনো নিরাশ করেন না। নিশ্চয় মিশর থেকে সাহায্য চলে আসবে। তকিউদ্দিন একটু আবেগী, কিন্তু দায়িত্বহীন নয়। আচ্ছা, তুমি ঠিক করে বলো তো, পথে কোন বাঁধা নেই তো!'

'না সুলতান, আমি জানি, শত্রুরা কোথাও ওঁৎ পেতে বসে নেই। গোয়েন্দারা জানিয়েছে, আমাদের ফৌজ আসার পথে কোথাও কোন বাঁধা নেই।' বললো হাসান বিন আবদুল্লাহ।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এই অসহনীয় সংকটময় মুহূর্তে সুলতান আইয়ুবী খুবই উৎকণ্ঠা ও পেরেশানীর মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছিলেন মিশর থেকে সৈন্য সাহায্য আসার অপেক্ষায়।

যদি সে সময় আল মালেকুস সালেহ, সাইফুদ্দিন ও গুমাস্তগীনের সম্মিলিত বাহিনী তার ওপর আক্রমণ করে বসতো, তবে বলা যায় না, হয়তো তারা তাঁকে পরাজিত করতে পারতো। কারণ তাঁর কাছে সৈন্য ছিল নিতান্তই কম। মরুভূমিতে যেভাবে ঝটিকা আক্রমণ করা যায় পার্বত্য অঞ্চলে সে চাল চালানোও ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শত্রুরা তাঁর এ অবস্থা হয়তো জানতো না।

খৃস্টানরা তাঁর ওপর আক্রমণ করার পরিবর্তে মুসলিম শাসকদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের দিয়ে যুদ্ধ চালানোর পাঁয়াতারা করছিল।

সুলতান আইয়ুবী এ অসহায় অবস্থায় আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে কেবল এ দোয়াই করছিলেন, 'আয় আল্লাহ, তোমার গায়েবী মদদ দিয়ে আমাদের সাহায্য করো। এই সংকটময় অবস্থায় যেন শত্রুরা আক্রমণ করে না বসে তুমি সে ব্যবস্থা করে দাও।'
মনে হয় আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। শত্রুরা তখনো কেবল প্রস্তুতিই নিচ্ছিল, কিন্তু হামলা করতে কেউ এগিয়ে এলো না।

•

সুলতান আইয়ুবীর অস্থিরতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারতেন না। যেসব জায়গায় তিনি তাঁর সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছিলেন, রাতেও সে সব স্থানে টহল দিয়ে বেড়াতেন। লক্ষ্য করতেন, তাঁর এই অল্প সংখ্যক সৈন্য কেমন সতর্ক ও সাহসিকতার সাথে ডিউটি করছে।
তাদের দেখে তাঁর মনে এই আশা ও বিশ্বাস জাগতো, সৈন্য কম হলেও এই বাহিনী শত্রুদের গতি রোধ করে দিতে পারবে।
কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ লিখেছেন, 'সুলতান ইউসুফ সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর তখন চরম বিপদ আপতিত। যদি আল্লাহ শত্রুদের সফলতা মঞ্জুর করতেন, তবে শত্রুর দল সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে অসহায় অবস্থার মধ্যে আক্রমণ করে বসতো। কিন্তু আল্লাহ যাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে চান সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে (আল-কোরআন-৮/৪৩)।

তারা সুলতান আইয়ুবীকে এমন সময় সুযোগ দিয়ে রেখেছিল যে, মিশর থেকে নিরাপদেই আইয়ুবীর সৈন্য সাহায্য এসে পৌছলো। সুলতান আইয়ুবী সেই সৈন্যদের নিজের বাহিনীর সঙ্গে একীভুত করে নিলেন। তাদেরকে যুদ্ধের নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। নতুন পরিবেশে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কৌশল শিখিয়ে দিলেন।

হিম্মাত পর্বত শ্রেণীর মাঝে দু'টি শৃঙ্গ দানবের শিংয়ের মত দু'দিক খাড়া ছিল। আইয়ুবী তাকে শত্রুদের জন্য একটি ফাঁদ বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা শুধু প্রতিরক্ষা করা সম্ভব ছিল, আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার পর পরই যে প্রতি আক্রমণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে সে সুযোগ তাঁর চোখে পড়ছে না।
তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে, খৃস্টানরা চেষ্টা করছে, নিজেরা আক্রমণে না এসে মুসলমান শাসকদের ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের মাধ্যমে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে। তারা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করতে আগ্রহী।
তারা চাচ্ছে, সুলতান আইয়ুবীকে পাহাড়ী এলাকায় অবরোধের মধ্যে আটকে রাখতে। সুলতান যেন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন।
কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে তিনি এ সংবাদ পাননি, নয়জন ফেদাইন গুপ্তঘাতক তাঁকে হত্যা করতে আসছে।
তাঁর দৃষ্টি সব সময় যুদ্ধের ময়দানের দিকেই ছিল। নিজের

প্রাণের মায়া তার কখনোই ছিল না, নিজেকে রক্ষার কোন খেয়ালও ছিল না তার। তিনি পরিস্থিতি দেখার জন্য দূর দূরান্ত পর্যন্ত লোক পাঠিয়ে রেখেছিলেন।
দু'দিন পর। হারান থেকে সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা এলো। সে এসে সংবাদ দিল, সেনাপতি শামস বখত ও সেনাপতি সাদ বখত ধরা পড়ে গেছে এবং এখন তারা গুমাস্তগীনের কারাগারে বন্দী। তাঁরা কাজী ইবনুল খাশিবকে হত্যা করেছে।'
'কাজীকে ওরা হত্যা করলো কেন?' জানতে চাইলেন সুলতান।
কাজীকে কেন ওরা খুন করলো সে কারণ গোয়েন্দা বলতে পারলো না।
সুলতান আইয়ুবীর চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন গূঢ় কারণ আছে!'
এ দুই ভাইয়ের সাথে সুলতানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি তাঁদের নিয়ে অনেক আশা করতেন। তিনি জানতেন, গুমাস্তগীনের বাহিনীর কমাণ্ড ওঁদের দুই ভাইয়ের হাতেই থাকবে আর তাদের বাহিনী ময়দানে এসে যুদ্ধ করার পরিবর্তে আত্মসমর্পণ করে ফেলবে।
তিনি গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এখন গুমাস্তগীনের বাহিনীর কমাণ্ড করবে কে?'
গোয়েন্দা জানালো, 'সম্মিলিত বাহিনীর আওতায় এখন গুমাস্তগীনের সৈন্যদের কমাণ্ড তিনি নিজেই করবেন।'

'হাসান বিন আবদুল্লাহ!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এ দুই ভাইকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। বর্তমানে হারানে কি পরিমান স্পাই আছে ভাল ভাবে খোঁজ নাও। তারা কি সেনাপতি দুই ভাইকে কারামুক্ত করে আনতে পারবে?'
তিনি আরো বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, গুমাস্তগীন এদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেবে। কারণ, সে তো জেনেই গেছে, এ দুই ভাই আমার গোয়েন্দা! আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আমি এক্ষুণি গিয়ে হারান অবরোধ করি এবং কেল্লা অধিকার করে তাদেরকে মুক্ত করে আনি।
এ দুই সেনাপতিকে বাঁচানোর জন্য যদি দু'শো কমাণ্ডোও শহীদ হয়ে যায়, তাতেও আমার আপত্তি নেই। হারানে যদি আমাদের লোক সংখ্যা কম থাকে তবে এখান থেকে কমাণ্ডোদের জলদি পাঠিয়ে দাও। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগেই ওদের মুক্ত করে আনতে হবে।'
'অবশ্যই। আমি এখুনি সে ব্যবস্থা নিচ্ছি!' বললো হাসান বিন আবদুল্লাহ।
হলব প্রদেশ সুলতান আইয়ুবীর বিরোধীদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সে কারণে খৃস্টানদের পাঠানো তীর-ধনুক, গোলা-বারুদ ও ঘোড়ার বহর সাহায্য হিসেবে হলবেই গিয়ে পৌছতে লাগলো।
খৃস্টানরা হলবাসীদের মধ্যে যে আবেগ অনুভূতি দেখেছিল, হলববাসী সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যেভাবে প্রাণপণ লড়াই করে সুলতান আইয়ুবীর অবরোধের মোকাবেলা করেছিল,

তাতে তারা ছিল উৎফুল্ল। তাছাড়া ভৌগলিকভাবেও হলব ছিল বিরোধী মহলের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি।
এদিকে মুশালে সাইফুদ্দিনকে ও হারানে গুমাস্তগীনকেও খৃস্টানরা রসদ সামগ্রী পাঠালো সাহায্য হিসাবে। সবাইকে খবর পাঠালো জলদি হলবে গিয়ে একত্রিত হতে।
তিন বাহিনী হলব শহরের বাইরে এক মুক্ত মাঠে একত্রিত হলো। তিন বাহিনী প্রধানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো, তবে তার কোন লিখিত রূপ ছিল না। চুক্তির একমাত্র স্বাক্ষী ছিল খৃস্টান উপদেষ্টারা।

সে রাতে মুশালের কারাগারে খতীব ইবনুল মাখদুম প্রদীপের আলোয় বসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন।
তার মেয়ে সায়েকা তখনো সেই কামরায়, যেখানে তাকে বস্তাবন্দী করে এনে রাখা হয়েছিল। বাড়ীতে মাত্র ওরা দু'জন, সায়েকা ও গুমাস্তগীনের সেই বডিগার্ড, যে তাকে গুমাস্তগীনের নির্দেশে উঠিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল।
যারা তাদেরকে ধরে এখানে নিয়ে এসেছে সেই কমাণ্ডোদের দু'জন বাড়ির পাহারায় রইলো, বাকীরা বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে।
অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওরা গিয়ে পৌঁছলো কারাগারের ওখানে। কারাগারের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো কমাণ্ডোরা।
কারাগারের দেয়াল যথেষ্ট উঁচু এবং প্রশস্ত। গেটে প্রহরী মোতায়েন। প্রাচীরের উপরেও প্রহরীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে,

যদিও তাদের সংখ্যা বেশী নয়।
কারাগারের সেই দারোগা, যে খতীবকে মুক্ত করে দিতে অঙ্গীকার করেছিল, সে প্রাচীরের উপরে চলে গেল। প্রহরীদের ডিউটি চেক করার উসিলায় প্রহরীদেরকে ডেকে একদিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর দারোগা টহলরত প্রহরীদের সাথে আলাপ জুড়ে দিল।
এই ফাঁকে নিচে লুকিয়ে থাকা কমাণ্ডোরা রশি ছুঁড়ে দিল প্রাচীরের ওপর। রশির এক মাথায় লোহার আংটা বাঁধা ছিল। কিন্তু তাতে জড়ানো ছিল কাপড়, যাতে প্রাচীরে আঘাত লেগে বেশী শব্দ না হয়। আংটা উপরে গিয়ে কোথাও আটকে গেল। একে তো অন্ধকার, অন্যদিকে দারোগা প্রহরীদেরকে ডেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ওরা কিছুই টের পেলো না।
চারজন কমাণ্ডো রশি বেয়ে উপরে উঠে গেল। উপরে উঠে রশি টেনে তুলে ভেতরের দিকে ফেলে সেই রশি ধরে তর তর করে নেমে গেল নিচে।
দারোগা আগেই তাদের হাতে কারাগারের অভ্যন্তরের নকশা এঁকে দিয়েছিল। প্রাচীরের পর বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা। তারপর কারাগারের অফিস কক্ষ, বন্দীদের থাকার কামরা, নির্যাতন সেল এইসব।
অফিসের সামনে এবং আরো বেশ কয়েকটি জায়গায় মশাল জ্বলছিল। এতে কারাগারের ভেতরটায় নজর বুলানো এবং চলাচল সহজ হয়ে গেল ওদের জন্য।
মশালের চাপ চাপ আলো-আঁধারীর ভেতর দিয়ে বন্দীখানার

দিকে এগিয়ে চললো চারজন।
সকলেই হাতে খঞ্জর বের করে নিয়েছে। লাইন ধরে এগিয়ে গেল ওরা এবং বন্দীখানার বারান্দায় পৌঁছে গেল।
ওখানে পৌঁছেই ওরা দেখতে পেলো, একজন প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। চারজনই দেয়ালের সাথে সেঁটে গিয়ে অন্ধকারে নিজেদের লুকিয়ে ফেললো।
প্রহরী বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাদের কাছে চলে এলো।
প্রহরী হয়তো তাদের পার হয়েই চলে যেতো, কিন্তু শেষ মাথায় যে কমাণ্ডো ছিল সে তার সামনে এগিয়ে এসে বললো, 'এদিকে এসো তো ভাই!'
হঠাৎ অন্ধকার থেকে একজন লোককে তার সামনে আসতে দেখে সে প্রথমে মনে করলো অন্য কোন প্রহরী কোন কাজে এদিকে এসেছে।
সে 'কি ব্যাপার?' বলে সবে একটি পা তুলেছে তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, পেছন থেকে দু'জন এসে জাপটে ধরলো তাকে এবং সে কিছু বুঝে উঠার আগেই দু'টি খঞ্জর আমূল ঢুকে গেল তার বুকে। খঞ্জর দু'টি এমন জায়গায় বিদ্ধ হলো, অবাক হওয়ারও সময় পেল না লোকটি, তার আগেই মারা গেল।
চারজনই দ্রুত সামনে অগ্রসর হলো। একজন আগে, বাকীরা তার পিছনে।
তারা অগ্রসর হতে হতে কারাগারের অন্য একটি অংশে এসে গেল। সামনে একটি গোল চত্বর, তারপর আবার শুরু হয়েছে

বন্দীদের থাকার কামরা।
এ গোল চত্বরটি পার হওয়ার পর যে কামরাগুলো শুরু হয়েছে তারই তৃতীয় কামরাটিতে আছেন খতীব।
সামনের কমাণ্ডো কামরার কাছে পৌঁছে গেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, তিনি কোরআন তেলাওয়াত করছেন।
সে ছোট্ট করে একটু গলা খাকারি দিল। খতীব কোরআন পাঠ বন্ধ করে তাকালেন জানালা পথে। দেখলেন ওখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।
তিনি কোরআন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।
দারোগার মাধ্যমে সেলের একটি ডুপ্লিকেট চাবি কমাণ্ডোরা আগেই সংগ্রহ করে রেখেছিল। সে তাড়াতাড়ি তালায় চাবি ঢুকিয়ে চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল তালা। খতীব খোলা দরজা দিয়ে কামরার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।
এ সময় কারো দৌড়ে আসার পদধ্বনি শোনা গেল। শোনা গেল লোকটির হাঁক, 'কে ওখানে?'
এদিক থেকেও বলা হলো, 'দেখে যাও বন্ধু!'
লোকটি ওখানে এসে পৌঁছতেই সহসা একটি খঞ্জর এসে তার বুকে বিঁধে গেল।
লোকটি এই অতর্কিত আক্রমণের প্রত্যাশা করেনি, সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যেই চিৎকার করতে যাবে, পিছন থেকে এক কমাণ্ডো তার মুখ চেপে ধরে তার হাতের খঞ্জর চালালো লোকটির বুকে। কলিজা ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেল সে খঞ্জর।

লোকটির ছটফটানি ঠাণ্ডা হতেই ওকে আস্তে করে বারান্দায় নামিয়ে রেখে খতীবের হাত ধরে ছুটলো ওরা, লক্ষ্য, রেখে আসা রশি পর্যন্ত পৌঁছানো।

কোন রকম বাঁধাবিঘ্ন ছাড়াই ওরা কারা প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হলো। এক কমাণ্ডো রশি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

সে উপরে উঠে রশিতে ঝাকুনি দিয়ে ইশারা করলো, একজন কমাণ্ডো খতীবকে বললো, 'এবার আপনার পালা। দয়া করে চেষ্টা করুন। দেরী করবেন না, যে কোন মুহূর্তে বিপদে পড়ে যেতে পারি আমরা!'

খতীব রশি বেয়ে উঠা শুরু করলেন। বুড়ো মানুষ, তার ওপর কমাণ্ডোদের মত কোন ট্রেনিং নেই তার, ফলে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো তাকে উপরে উঠতে। এরপর একে একে উঠে এলো সব কমাণ্ডোরা।

দারোগা প্রহরীদের তখনো আটকে রেখেছিল।

সবাই উপরে উঠে এলে রশি টেনে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিল এক কমাণ্ডার। নিরাপদেই একে একে নিচে নেমে এলো সবাই।

দারোগা কারাগারের বাইরে শেয়ালের ডাক শুনতে পেলো। বুঝলো কমাণ্ডোরা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পেরেছে।

যেখানে রশি ঝুলছিল তার উল্টো দিকে প্রহরীদের ডিউটিতে পাঠিয়ে দিয়ে দারোগা রওনা দিলো রশির দিকে।

দ্রুত রশির কাছে পৌঁছে রশি বেয়ে নিচে নেমে এলো দারোগা নিজেও। তারপর সবাই মিলে রওনা দিল যেখানে সায়েকাকে

রেখে এসেছিল, সেখানে।
ওরা যখন সেখানে পৌঁছলো, সায়েকা তার বাবাকে দেখে আবেগ সামলাতে পারলো না, ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়লো বাপের বুকে।
সায়েকা কিছুটাক্ষণ অবস্থান করা যাবে না। ভোর হওয়ার আগেই শহর থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে পড়তে হবে আপনাদের। বাইরে ঘোড়া রেডি। আপনারা রওনা করুন, সাথে পথ প্রদর্শক হিসাবে থাকবে আমাদের এক ভাই।'
ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কেটে গেল রাত। যখন ভোর হলো তখন মুশাল থেকে কয়েক মাইল দূর দিয়ে চারটি ঘোড়া ছুটছিল প্রাণপণে। একটির উপরে খতীব, দ্বিতীয়টিতে সায়েকা, তৃতীয়টির উপর দারোগা এবং চতুর্থটিতে ছিল তাদের পথ প্রদর্শক এক কমাণ্ডো।
এই কমাণ্ডো সুলতান আইয়ুবীর জন্য নিয়ে যাচ্ছিল গুমাস্তগীনের বডিগার্ডের কাছ থেকে সংগ্রহ করা মূল্যবান তথ্য।
মুশাল থেকে বহু দূরে চলে এসেছে এই ছোট্ট কাফেলা।
গুমাস্তগীনের বডিগার্ডের লাশ সেই গোপন কক্ষের ভেতর দাফন করা হয়ে গেছে। রাতে তারা পালিয়ে আসার পর ওখানকার কমাণ্ডোরা বডিগার্ডকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলে।
ওরা যখন বডিগার্ডের লাশ গুম করছিল সে সময় কারাগারের অভ্যন্তরে চলছিল হুলুস্থুল ব্যাপার। ভয়াবহ কিয়ামত শুরু হয়ে গিয়েছিল সেখানে।

ওরা বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণ পর। এক প্রহরীর চোখে পড়লো খতীবের কামরার দরজা খোলা, ভেতরে প্রদীপ জ্বলছে।
প্রহরী ব্যাপার কি দেখার জন্য এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলো বারান্দায় এক প্রহরীর লাশ পড়ে আছে। সে চিৎকার জুড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো আরো কয়েকজন পাহারাদার।
মুহূর্তে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র কারাগারে। দু'জন প্রহরীর লাশ ও খতীবের পলায়নের খবর দেয়ার জন্য প্রহরীরা ছুটলো জেল দারোগার কাছে। অফিসে দারোগাকে পাওয়া গেল না। প্রাচীরের ওপর, কারাগারের ভেতর সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও দারোগাকে না পেয়ে সহকারী দারোগা বুঝলো তিনিও পালিয়েছেন।
এক প্রহরী এসে খবর দিল, 'প্রাচীরের বাইরে রশি ঝুলছে। নিশ্চয়ই দারোগার জোগসাজশে খতীবকে কোন কমাণ্ডো বাহিনী এ পথে বাইরে নিয়ে গেছে। সেই সাথে পালিয়েছে দারোগা।'
রাতের শেষ প্রহর। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও দারোগাকে না পেয়ে রিপোর্ট করার জন্য সহকারী দারোগা ছুটলো মুশালের শাসক সাইফুদ্দিনের প্রাসাদে।
শহরে তখন ফজরের আজান হচ্ছিল। সহকারী দারোগা ফটকে পৌঁছে প্রহরীকে বললো, 'খুবই জরুরী সংবাদ আছে, এখুনি বাদশাহর কাছে এ খবর পৌঁছাতে হবে।' তার চেহারায় ত্রস্ততা ও পেরেশানীর ছাপ।
প্রহরী তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিল, ভেতরে ঢুকলো সহকারী দারোগা।
মুশালের শাসক সাইফুদ্দিন সারারাত ঘুমাননি। সায়েকাকে

আনার জন্য সেই যে তিনি বিশ্বস্ত বডিগার্ডকে পাঠিয়েছেন, সেই থেকে অপেক্ষা করছেন তার ফিরে আসার।

যতই সময় যাচ্ছে ততই অস্থিরতা ও পেরেশানী বাড়তে লাগলো তার। শেষ রাতে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, বডিগার্ড বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মেয়েটির রূপ যৌবনে মুগ্ধ হয়ে বডিগার্ড লোভ সামলাতে পারেনি, নিজেই তাকে ভাগিয়ে নিয়ে হয়তো কোথাও পালিয়ে গেছে।

কিন্তু তারপরও তিনি ঘুমাতে পারলেন না, মেয়েটিকে নিয়ে বডিগার্ড ফিরে আসবে এই আশাও তিনি একেবারে ত্যাগ করতে পারলেন না।

কখনো ভাবছেন, সায়েকাকে নিয়ে হয়তো এখনি ফিরে আসবে বডিগার্ড। আবার আক্রোশে ফেটে পড়ছেন, যদি নিয়ত খারাপ ও সত্যি ভেগে গিয়ে থাকে তবে দুনিয়ার শেষ মাথা পর্যন্ত ধাওয়া করে হলেও তাকে ধরে এনে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা তিনি করবেন।

কিন্তু তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না, সায়েকা ও তার বডিগার্ডকে কেউ অপহরণ করতে পারে এবং বডিগার্ডকে খুন করে ওরা সায়েকাকে নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যেতে পারে।

সাইফুদ্দিন যখন এমনি অস্থিরতায় ছটফট করছিলেন তখুনি সেখানে পৌঁছলো সহকারী দারোগা।

সাইফুদ্দিন তখন উৎকর্ণ এবং বার বার গেটের দিকে তাকাচ্ছিলেন। গেট খোলার আওয়াজ হতেই তিনি ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। সহকারী দারোগা ঢুকেই তার মুখে পড়ে গেল।

সাইফুদ্দিন তাকে দেখেই গর্জে উঠলেন, 'এ অসময়ে তুমি এখানে কেন? কি চাও তুমি?'
দারোগা কাচুমাচু হয়ে বললো, 'ভয়ংকর দুঃসংবাদ হুজুর। খতীবকে কারা যেন কারাগার থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।'
'কি বললে!' এ অবিশ্বাস্য সংবাদ যেনো তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। তিনি ধমকের সুরেই বললেন, 'খতীবকে কারাগারের সুরক্ষিত কক্ষ থেকে অপহরণ করেছে, তোমরা ওখানে কি করতে আছো?'
'এটা কোন কমাণ্ডো বাহিনীর কাজ। সমস্ত ঘটনা ঘটেছে আমাদের অলক্ষ্যে। আমরা কিছুই টের পাইনি। আমাদের দু'জন প্রহরীকেও ওরা খুন করে ফেলে রেখে গেছে।
সবচে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে, আমাদের দারোগাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো তাকেও অপহরণ করা হয়েছে, অথবা তিনিও এ ঘটনার সাথে জড়িত। তারই জোগসাজসে এ ঘটনা ঘটেছে এবং খতীবকে পার করার পর তিনি নিজেও পালিয়ে গেছেন।'
সাইফুদ্দিনের জবান বন্ধ হয়ে গেল। তিনি সহকারী দারোগার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শহরে ফজরের আজানের রেশ ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। পূর্বাকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে একটু একটু করে।
হারানের কারাগারে সেনাপতি শামস বখত ও সেনাপতি সাদ বখত তখনো বন্দী। সুলতান আইয়ুবী হাসানকে আদেশ দিয়েছেন, সেখান থেকে তাদেরকে যে কোন মূল্যে বের করে আনতে হবে।

হারানে আইয়ুবীর যেসব গোয়েন্দা ছিল তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে হলেও এ দুই সেনাপতিকে মুক্ত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে এবং প্রতিটি বিভাগে এ দুই ভাই দু'একজন করে নিজস্ব লোক আগে থেকেই সেট করে রেখেছিলেন।

কিন্তু গুমাস্তগীনের কারাগার থেকে সেনাপতিদের উদ্ধার করা ছিল খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ তাদেরকে রাখা হয়েছিল কারাগারের দুর্ভেদ্য গোপন কক্ষে। সেখান থেকে তাদেরকে কি করে বের করে আনা যায় তার কোন পথই বের করতে পারছিল না ওরা।

আল্লাহই তাদেরকে সাহায্য করলেন। হলব থেকে গুমাস্তগীনের জরুরী ডাক আসলো, তিনি তার উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, উপদেষ্টা ও দেহরক্ষীসহ সেখানে চলে গেলেন।

সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখতের গ্রেফতারীর খবর শুধু গুমাস্তগীনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছাড়া আর কেউ জানতো না। কাজীর হত্যাকাণ্ডের বিষয়টিও তেমন গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়নি।

সেনাবাহিনীর জওয়ানরাও অধিকাংশই জানতো না সেনাপতিদ্বয়কে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি গোপন রাখার জন্য গুমাস্তগীনের কঠোর নির্দেশ ছিল।

গুমাস্তগীনের চলে যাওয়ার পরের দিন। কারাগারের দারোগা দেখলো, হলবের দিক থেকে কয়েকটি ঘোড়া দ্রুত বেগে ছুটে আসছে। এখনো তারা অনেক দূরে। কয়টি ঘোড়া তা এখনো

স্পষ্ট নয়, তবে ধূলিঝড় দেখে মনে হচ্ছে, তিন চারটি হতে পারে।

দারোগা ওদের আগমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারা যখন কারাগারের কাছাকাছি হলো তখন দারোগা দেখতে পেলো, মোট পাঁচটি ঘোড়া, দু'টি আরোহী শূন্য, তিনটির পিঠে বসে আছে তিনজন উর্ধতন সামরিক অফিসার।

দিনের বেলা। ঘোড়া কারাগারের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। সামনের আরোহীর হাতে হারানের জাতীয় পতাকা। যুদ্ধের ময়দানে প্রধান সেনাপতির হাতেই এমন পতাকা সচরাচর দেখা যায়।

এ আরোহীদের মধ্যে একজন ছিল জেনারেল পদমর্যাদা সম্পন্ন, অপর দু'জনও উর্ধতন সামরিক অফিসার।

এদের দেখে মনে হচ্ছিল, এরা খুব পেরেশান এবং পথশ্রমে ক্লান্ত।

কারাগারের দারোগা গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখছিল ওদের, দলনেতাকে সে ভাল ভাবেই চিনতে পারলো।

সে গেটের বাইরে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কেন এসেছেন?'

'আর বলো না! রাজা-বাদশাহদের কখন যে কি খেয়াল হয়!' দলনেতা বললো, 'সেনাপতি দুই ভাই নাকি বাদশাহ নামদারের সাথে বেয়াদবী করেছিল। রাগের চোটে তিনি তাদের কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। যখন এ ঘটনা ঘটে তখন তিনি ছিলেন মদে মাতাল।

এদিকে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী তৈরী হচ্ছে। সেনাপতি ছাড়া তো আর যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া যায় না,

তাহলে তো সেনাবাহিনীই অচল হয়ে পড়ে। এখন আবার আদেশ হয়েছে, জলদি দুই সেনাপতিকে কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসো এবং তাদের বলো, তাড়াতাড়ি বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে।'

'এখন আপনারা কি দুই সেনাপতিকে নিয়ে যেতে এসেছেন?' দারোগা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ!' কমাণ্ডার বললো, 'তাদেরকে জলদি নিয়ে যেতে হবে।'

'আপনাদের কাছে কি কেল্লাধিপতির কোন লিখিত পত্র আছে?' দারোগা বললো, 'তিনি তো এখন কেল্লার বাইরে আছেন?'

'হ্যাঁ, আমরা তো সেখান থেকেই আসছি!' কমাণ্ডার বললো, 'হলবে তিন বাহিনী প্রধান মিলিত হয়েছেন। ওখানেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে, হলব, হারান ও মুশালের বাহিনী একত্রিত হয়ে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান চালাবে।

এ সিদ্ধান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদের ডেকে বললেন, 'এখনি রওনা হও। শামস বখত ও সাদ বখতে বলবে, জলদি বাহিনীকে তৈরী করতে। আমরা তিনজন মিলে অভিযানের খুঁটিনাটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করছি। পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেলে আমি নিজে চলে আসবো বা কি করতে হবে খবর পাঠাবো। দু'একদিনের মধ্যেই যেনো বাহিনী অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে ফেলে। আইয়ুবীকে কোন কিছু বুঝতে না দিয়েই আমরা অতর্কিতে তার ওপর সম্মিলিতভাবে ঝাপিয়ে পড়বো।'

সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম আমরা। আমি বললাম, 'উনারা তো কারারুদ্ধ! আপনার কোন আদেশপত্র...'

তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'সে জন্যই তো তোমাকে পাঠাচ্ছি। ওরা আমার ওপর গোস্বা করে থাকতে পারে, তুমি ওদের মান ভাঙ্গিয়ে রাজি করাবে। সেনাপতিদের মনে ক্ষোভ বা অভিমান থাকলে ওরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লড়াই করতে পারবে না।'

কেল্লাধিপতির এ আদেশের ওপর আর কথা চলে না, তাই কোন লিখিত আদেশের জন্য আর তাকে চাপ দিতে পারিনি।'

দারোগার কণ্ঠে দ্বিধা, 'কিন্তু লিখিত আদেশ ছাড়া ....' শান্ত হলে কমাণ্ডোদের ইনচার্জ বললো, 'এখানে বেশী

'দেখো, এটা যুদ্ধের সময়। আমাদের সেনাবাহিনী হলব ও মুশালের সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে একযোগে সুলতান আইয়ুবীর ওপর আক্রমণ চালাবে। যদি আমরা সময় নষ্ট করি তবে সুলতান আইয়ুবী আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে। ভয় তো সেখানেই।

তুমিও জানো, গুমাস্তগীন কি কারণে হলবে গিয়েছেন। আর এটাও জানো, এ দুই সেনাপতি ছাড়া আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

আমরা হলব থেকে ছুটে এসেছি এ দুই সেনাপতিকে জাতীয় মর্যাদায় গার্ড-অব-অনার দিয়ে নিয়ে যেতে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, আমাদের হাতে যুদ্ধের পতাকা! সেনাপতি ছাড়া এ জাতীয় পতাকার সম্মান কে রক্ষা করবে?

বেশী কথা বলার সময় এটা নয়, তুমি যদি এ পতাকাকে অসম্মান করো, তার পরিণতির জন্য আমরা দায়ী থাকবো না। যা করার দ্রুত করো।'

দারোগা তাদেরকে ভিতরে নিয়ে গেল। ঘোড়া রেখে ওরা

চললো সেই কারা কক্ষে, যেখানে সেনাপতিদ্বয় বন্দী আছেন। সাধারণ কারাবন্দীদের এলাকা পার হয়ে ওরা বিপদজনক কারাবন্দীদের জন্য সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য কারাঞ্চলে প্রবেশ করলো। ভূগর্ভস্থ এ অঞ্চলের দুটি আলাদা কামরায় দুই সেনাপতি বন্দী আছেন।

প্রথমে ওরা প্রবেশ করলো শামস বখতের কামরায়। দলনেতা তাঁকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করে বললো, 'হারানের আমীর গুমাস্তগীন আপনার মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। আপনার ঘোড়া ও আপনার নিজস্ব'রক্ষী আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

আইয়ুবীর বিরুদ্ধে হলব, হারান ও মুশালের সম্মিলিত বাহিনীর অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য হারানের ফৌজ নিয়ে আপনাকে জলদি হলব যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলেছেন।'

'মনে হচ্ছে এখন তার মদের নেশা কেটে গেছে? আমি তো এ কথাই তাকে বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে, সম্মিলিত জোটে আমাদের অংশ গ্রহণ করা দরকার আর যত দ্রুত সম্ভব আইয়ুবীর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়ে যাওয়া দরকার।

তিনি আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, 'বেয়াদব, কি করতে হবে আমি বুঝবো। কোনটা দরকার আর কোনটা নয়, সেটা কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে?'

তা, এখন তিনি একাই যুদ্ধ করুন, আমাদের দরকার কি? আমরা কারাগারে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে নেই!'

কমাণ্ডার বললো, 'দেখুন, এটা মান-অভিমানের সময় নয়। আমি মহামান্য দুর্গাধিপতির আদেশ নিয়ে এসেছি। আপনার কাছে এ আদেশ পৌছানো আমার দায়িত্ব ছিল, এখন কি করবেন সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আপনার।'

দারোগা তাদের কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনলো। এতে তার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহ সব দূর হয়ে গেল।
সে এগিয়ে বললো, 'আপনাদের মুক্তির আদেশ হয়ে গেছে, এখন আপনি মুক্ত।' দারোগা কামরার তালা খুলে দিল।
সেখান থেকে ওরা গেল সাদ বখতের কক্ষে। সেনাপতি সাদ বখত দলনেতাকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো, 'ও তুমি এসে গেছো? সব কিছু ঠিক আছে তো?'
দলনেতার পেছনে দারোগাকে সে লক্ষ্য করেনি।
দারোগা বোকা বা গর্দভ ছিল না। তার সারাটি জীবন কেটেছে এই কারাগারে। সে এ কথার মর্ম ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারলো এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের বোকামীর কথা স্মরণ করে শিউরে উঠলো।
দরোজা খোলার পরিবর্তে সে ফিরে আগত কমাণ্ডারকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'দুঃখিত, লিখিত আদেশ ছাড়া আমি এদের মুক্তি দিতে পারবো না।'
কমাণ্ডার তার হাতে থাবা মেরে তার হাত থেকে চাবির গোছা ছিনিয়ে নিল। তার দুই সঙ্গী দু'পাশ থেকে দারোগাকে চেপে ধরলো। দু'জনের হাতেই খঞ্জর বেরিয়ে এসেছে।
তারা দারোগার পিঠে খঞ্জর ঠেকিয়ে তার কানে কানে বললো, 'আমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর লোক। তুমি তো ভাল করেই জানো, সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনী কতটা কুশলী ও দক্ষ। জোরে শব্দ করো না, জানে মারা পড়বে।'
কমাণ্ডার দ্রুত চাবি ঢুকিয়ে তালা খুলে ফেললো। খোলা দরোজা দিয়ে বেরিয়ে এলো সাদ বখত।
কমাণ্ডোরা দারোগাকে ঠেলে সেই খালি কামরায় এমন ভাবে

ঢুকিয়ে দিলো, কেউ দেখলে ভাবতো, তিনি কক্ষ পরিদর্শনে ঢুকছেন।

দারোগার সঙ্গে কমাণ্ডোরাও গিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তারা দারোগাকে দরজার আড়ালে নিয়ে গেল।

এক কমাণ্ডো এমন জোরে দারোগার গলা পেঁচিয়ে ধরলো যে, দারোগার চোখ উল্টে গেল। ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল দারোগা।

তাকে আস্তে করে কয়েদীরা যে বিছনায় শোয় সে বিছনায় লম্বা করে শুইয়ে দিলো। পরে লাশের ওপর কম্বল চাপিয়ে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো কমাণ্ডোরা।

তারা বাইরে বেরিয়ে এসেই দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। কেল্লার ফটকের চাবি দারোগার কাছেই ছিল, বেরোনোর আগে দারোগার পকেট হাতড়ে সে চাবি নিয়ে এসেছে।

তালা মারা শেষ হলে এক সাথেই সব চাবি পকেটে পুরে গেটের দিকে রওনা দিল দলটি।

ওরা কারাগারের ভূগর্ভস্থ সেল থেকে বের হয়ে এলো।

কারাগারের ভূগর্ভস্থ সেলে আলাদা প্রহরী ছিল। ওরা নিজেদের ডিউটিতে ব্যস্ত থাকলেও দূর থেকেই দেখতে পেলো, কারাগারের দারোগা দুই কয়েদীকে মুক্ত করছে। কিন্তু বেরোনোর সময় দলের মধ্যে দারোগা আছে কিনা খেয়াল করেনি ওরা।

দুই প্রহরী পালা করে সেলের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

সেনাপতি সাদের কামরা অতিক্রমের সময় জানালা দিয়ে

প্রহরী দেখতে পেলো এক কয়েদী কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে।
এটা দেখে সে খুব অবাক হলো! সে জানতো এ কামরায় সেনাপতি সাদ বন্দী আছেন। দারোগা নিজে এসে এইমাত্র তাকে মুক্ত করে নিয়ে গেল, তাহলে শুয়ে আছে কে? এ কামরায় তো আর কোন বন্দী ছিল না!
সে শুয়ে থাকা কয়েদীর দিকে ভাল করে তাকালো। তার সর্বশরীর কম্বলে ঢাকা, এ জন্য তাকে চেনা যাচ্ছে না।
প্রহরী এবার গিয়ে উঁকি দিল শামস বখতের কামরায়। এ কামরায় কেউ নেই, সম্পূর্ণ খালি।
সে আবার ফিরে এলো সাদ বখতের কামরার সামনে। কম্বলে ঢাকা কয়েদীর দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে ডাকলো, কিন্তু কয়েদী কোন সাড়া দিল না।
কামরায় তালা লাগানো। প্রহরী জানালার ফাঁক দিয়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েদীকে খোঁচা দিল, তাতেও কয়েদী সাড়া না দেয়ায় প্রহরী বর্শার মাথা দিয়ে কম্বল সরিয়ে ফেললো।
কম্বল সরে যেতেই কয়েদীর মুখ দেখে ভয়ে সে এমন জোরে চিৎকার দিল যে, সে চিৎকার ভূগর্ভস্থ কারাগারের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুললো। বিস্ফারিত চোখে সে কারাগারের দারোগার সদ্য মৃত লাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। অন্য প্রহরী চিৎকার শুনে ছুটে এলো সেখানে।
সে এ দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু করলো, 'সাবধান! সাবধান! কে কোথায় আছো সাবধান হও সবাই। কারাগারের কয়েদী পালিয়েছে।'
দুই প্রহরী ডিউটি ফেলে পালিয়ে যাওয়া কয়েদীদের ধরার জন্য

ছুটলো উপরের দিকে। সেই সাথে চলতে লাগলো হাঁকডাক ও চিৎকার।
সাথে সাথে সমগ্র কারাগারে বেজে উঠলো বিপদ সংকেত। ভয়ংকর শব্দে বেজে চললো পাগলা ঘন্টা।
দুই সেনাপতিসহ কমাণ্ডো দলটি তখন গেটের কাছে পৌছে গেছে।
প্রহরীরা ছুটলো ওদের পেছনে। মেইন গেটের চাবী তখন কমাণ্ডো দলের কমাণ্ডারের কাছে। সে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সর্বশক্তি দিয়ে ছুটলো গেটের দিকে। কারণ, সে জানে, তালা খুলে একবার বাইরে যেতে পারলে বাঁচার তবু একটু আশা আছে, কিন্তু ভেতরে ধরা পড়ে গেলে নিজেদের মরণই শুধু ডেকে আনা হবে না, সেই সাথে এ দুই সেনাপতির মুক্তির আশাও চিরতরে ত্যাগ করতে হবে।
গেটে পৌঁছে গেল কমাণ্ডার, তালার ভেতর চাবি ঢুকিয়ে চাপ দিল। ছুটন্ত প্রহরীরা তখনো চিৎকার করে বলছে; 'ধরো, ধরো, কয়েদীরা পালিয়ে যাচ্ছে, গ্রেফতার করো ওদের। ওরা দারোগাকে হত্যা করে পালাচ্ছে!'
পাগলাঘন্টির আওয়াজে নরক গুলজার হয়ে উঠেছিল কারাগার। সমস্ত প্রহরী হাতের কাজ ফেলে ছুটছিল পাগলের মতো।
পাচিলের ওপর যারা ডিউটি দিচ্ছিল, তারা লাফিয়ে নামলো নিচে। বাইরে যেসব গার্ড ছিল তারা ভেতরে কি ঘটছে জানার জন্য জমা হচ্ছিল গেটে। কেউ কেউ গেট খোলার জন্য বাইরে থেকে গেটে থাপ্পড় দিচ্ছিল।
এই মহা হুলুস্থুলের মধ্যে দরজা একটু ফাঁক হতেই বাইরের

গার্ড ও সৈন্যরা হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করলো কেল্লার ভেতর। তাদের ধারনা, হয়তো কারাকক্ষের কয়েকদীরা বিদ্রোহ করেছে, নয়তো কোথাও আগুন লেগেছে।

যে সব প্রহরী ও গার্ড বাইরে থেকে হুড়মুড় করে ভেতরে প্রবেশ করছিল সেই ভিড়ের মধ্যে পলাতক কমাণ্ডো ও দুই সেনাপতি হারিয়ে গেল এবং ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্য দিয়েই তারা নিরাপদে বাইরে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হলো।

গেটের বাইরেই তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল। তারা ঘোড়ার উপরে আরোহণ করে রওনা করতে যাবে, এক টহল প্রহরীর নজরে পড়ে গেল তারা। প্রহরী তাদের সতর্ক করে বললো, 'কে তোমরা? থামো, নইলে মারা পড়বে!'

তারা প্রহরীর দিকে এক পলক তাকিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। প্রহরী তাড়াতাড়ি ধনুকে তীর জুড়ে পলায়নপর লোকদের দিকে তীর বর্ষণ শুরু করলো।

দু'টি তীর এক কমাণ্ডোর পিঠে বিদ্ধ হয়ে গেল, আর এক তীর বিদ্ধ হলো সেনাপতি শামস বখতের অশ্বের পিছনে।

তীরবিদ্ধ কমাণ্ডো পিঠে দু'টি তীর নিয়েও নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে ছুটে চলা অব্যাহত রাখলো। সেনাপতি শামস বখতের অশ্ব তীর খেয়ে পাগলের মত ছুটলো আর লাফাতে লাগলো।

সেনাপতি শামস বখত ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘোড়ার উল্টাপাল্টা লাফানো থামাতে পারলেন না। বহু কষ্টে তিনি তার ঘোড়াকে আহত কমাণ্ডোর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেলেন এবং দ্রুত লাফিয়ে নিজেকে কমাণ্ডোর ঘোড়ার ওপর ছুঁড়ে দিলেন।

কমাণ্ডো সামনের দিকে ঝুঁকে গেল। সেনাপতি শামস বখত তার হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম টেনে নিয়ে পিছনে বসেই তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।
অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা প্রহরীর তীরের আওতার বাইরে শুধু নয়, দৃষ্টিরও আড়ালে চলে যেতে সক্ষম হলো।
সেনাপতি পিছনে তাকালেন। কারাগার থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন তারা। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, কারাগারের দিক থেকে দশ বারটি ঘোড়া ছুটে আসছে। এখনো তারা বেশ দূরে, তবে তীব্রগতিতে ছুটে আসছে ওরা। একেবারেই খোলামেলা ও উন্মুক্ত প্রান্তরে ছিল ওরা। আশপাশে লোকালয়, পাহাড় বা এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লুকানো যায়। উপায়ান্তর না দেখে তারাও প্রাণপণে ঘোড়া ছুটালেন।
তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র খুব অল্প। দুই সেনাপতিই নিরস্ত্র, এক কমাণ্ডো এরই মধ্যে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েছে। সে আর মোকাবেলা করার মত অবস্থায় নেই, যে কোন মুহূর্তে শহীদ হয়ে যেতে পারে।
অবিরাম ছুটছে কাফেলা। প্রাণপণে, উর্ধশ্বাসে। পেছনে সমান তালে ছুটে আসছে ধাওয়াকারীরা।
অনেকক্ষণ হয়ে গেল, উভয়ের মাঝে দূরত্ব কমছেও না, বাড়ছেও না। দু'দলই মরিয়া হয়ে ছুটছে।
হঠাৎ সেনাপতির চোখের সামনে দূরে পাহাড় শ্রেণী ও টিলার সারি ভেসে উঠলো। তিনি সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য বললেন, 'বন্ধুরা! আরো জোরে! ওই দেখো পাহাড় দেখা যাচ্ছে!'

এক সময় ওরা এসে পৌঁছলো সেই পাহাড়ের পাদদেশে। ক্লান্ত, শ্রান্ত। শরীরের পেশীগুলো কোন ঘোষণা না দিয়েই যেনো ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছে। কিন্তু ঘুমোলে তো চলবে না, পেছনে তাড়া করে ছুটে আসছে দুশমন।

সেনাপতি শামস বখ্‌ত সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'সবাই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ো। একা একা লুকিয়ে যাও।'

তারা সবাই ছিল সুশিক্ষিত কমাণ্ডো যোদ্ধা। পিছু ধাওয়াকারীরা এখনো অনেক দূরে। সময় নষ্ট না করে ওরা একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে পাহাড়ের গোপন স্থানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোড়াগুলোও ওরা গোপন জায়গায় লুকিয়ে ফেললো। এখন কেউ পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ালে, একটু আগে এখানে কোন মানুষ বা ঘোড়া ছিল সে কথা সে কল্পনাও করতে পারবে না।

দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছিলো ওরা। শিকারী বাঘের মত নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল দুশমনের জন্য।

বেশী সময় লাগলো না, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধাওয়াকারীরা সেখানে পৌঁছে গেল। কিন্তু তারা এদিক ওদিক দৃষ্টি বুলিয়ে কোন মানুষ বা ঘোড়ার সন্ধান পেলো না।

ওদের কমাণ্ডার একবার ভাবলো, পাহাড়ে তল্লাশী চালায়, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, এরা আইয়ুবীর সুশিক্ষিত কমাণ্ডো বাহিনী। এদের খুঁজে পাওয়া কোন সহজ ব্যাপার নয়! বরং একবার ওদের নাগালে চলে গেলে জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়াও হয়তো সম্ভব হবে না কোনদিন।

তার মনে পড়লো, আইয়ুবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমাণ্ডো বাহিনী প্রতিপক্ষের বিশাল বাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছে, এমন

ঘটনা অতীতে বহুবার ঘটেছে। তার ওপর তাদের সাথে আছেন গুমাস্তগীনেরই দুই জাদরেল সেনাপতি। এ অবস্থায় আর সামনে অগ্রসর হওয়া হবে নিছক বোকামী।

তারা মনোবল হারিয়ে হতবিহ্বল চিত্তে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। শেষে কমাণ্ডার বললো, 'আর এগিয়ে কাজ নেই। ওদের নাগাল আমরা কোনদিনই পাবো না।'

ওরা ওখান থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে চললো কারাগারের দিকে।

হলবের বাইরে এক স্থানে তিন প্রদেশের মুসলিম আমীরদের কনফারেন্স হচ্ছে। বৈঠক শেষ হলো সুলতান আইয়ুবীর ওপর আক্রমণের প্ল্যান চূড়ান্ত করে। বেশীর ভাগ প্ল্যান-পরামর্শ দিল খৃস্টান উপদেষ্টারা।

সিদ্ধান্ত হলো, আক্রমণের জন্য গুমাস্তগীনের বাহিনী সামনে থাকবে। তার পাশে সাহায্যকারী হিসেবে থাকবে হলবের সৈন্য বাহিনী। প্রথম আক্রমণ করার পরে সুলতান আইয়ুবীর প্রতি আক্রমণের আঘাত সামাল দিতে এগিয়ে যাবে সাইফুদ্দিনের বাহিনী।

কিন্তু সাইফুদ্দিন এলাকায় ফিরে গিয়ে নিজের পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রইল। সে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে তার বাহিনীকে দুই ভাগ করে এক অংশ তার ভাই আজুদ্দিনের অধীনে ছেড়ে দিল। সম্মিলিত কমাণ্ডকে প্রতারণা করে বললো, 'এটা সংরক্ষিত বাহিনী। এদেরকে সংকট মুহূর্তে ব্যবহার করা হবে।' এদিকে তার ভাইকে বললো, 'তুমি হলব ও হারানের

সেনাবাহিনীর অবস্থা লক্ষ্য করে সামনে অগ্রসর হবে। যদি যুদ্ধের অবস্থা আমাদের প্রতিকূলে যায়, তবে আমাদের সৈন্যদেরকে মুশালে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ওদের নিয়ে তুমি মুশালের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবে। আর যদি আক্রমণে অংশ নিতেই হয় তবে আমাদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

রমজান শুরু হয়ে গেল। সম্মিলিত বাহিনী সিদ্ধান্ত নিলো, যুদ্ধের সময় রোজার কোন প্রয়োজন নেই। চতুর্থ রমজানে তিন বাহিনীর সৈন্যরা নিজ নিজ শহর ছেড়ে সমরাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হলো। তাদের সকলের টার্গেট হিম্মাতের পর্বতশ্রেণী। হিম্মাতের অনতিদূরে সকলের মিলিত হওয়ার কথা। সবাই এসে জড়ো হওয়ার পর পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হবে আক্রমণ।
এ অভিযান শুরু হওয়ার দু'দিন আগে সুলতান আইয়ুবী তাঁর সৈন্য সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ দেখছিলেন। এ সময় তার কাছে সংবাদ পৌছে, 'হারান থেকে সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখত এসে পৌছেছেন। তাদের সাথে একটি লাশও রয়েছে।'
সুলতান আইয়ুবী ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে গেলেন। অশ্ব থেকে লাফিয়ে নেমেই দুই সেনাপতিকে আলিঙ্গন করলেন। পরে দুই কমাণ্ডোর সাথেও আলিঙ্গন করলেন।
এ দুই কমাণ্ডো ছিল প্রসিদ্ধ দুই গোয়েন্দা অফিসার। সাহসী ও চৌকস গোয়েন্দা হিসাবে তাদের জুড়ি মেলা ভার। দীর্ঘদিন ধরে ওরা গুমাস্তগীনের সেনা দলে কাজ করছিল।

কোলাকুলি শেষ করে সুলতান লাশের পাশে গেলেন। মুখের কাপড় সরিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর লাশের গালে চুমো খেয়ে এক অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ লাশ দামেশকে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। 'জান্নাতুস শোহাদায়' স-সম্মানে একে দাফন করা হবে।'

'মুহতারাম সুলতান! আপনি আর রিস্তানের পর্বত শৃঙ্গে বসে আছেন কেন? যুদ্ধের ব্যাপারে কি চিন্তা করছেন?' সেনাপতি শামস বখত তাঁর কাহিনী শোনানোর আগে যুদ্ধের কথা শুরু করলেন।
'আমি মিশর থেকে সৈন্য সাহায্য আসার অপেক্ষা করছি।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'গতরাতে সংবাদ পেয়েছি, আজই সাহায্য এসে পৌঁছে যাবে। কায়রো থেকে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হলো বলে ওদের অনেক সময় লেগে গেল।'
এরপর সেনাপতিদের নিয়ে বসলেন সুলতান। তাদেরকে বিস্তারিত ভাবে জানালেন এখানকার সৈন্য সংখ্যা ও সৈন্যদের প্রস্তুতি সম্পর্কে। সেনাপতিদের কাছ থেকে জেনে নিলেন হারানের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর।
সেই দিনই বিকেল বেলা। সুলতান আইয়ুবী সমস্ত সেনা কমাণ্ডারদের ডাকালেন এবং দুই সেনাপতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাদের। পুরাতন সামরিক অফিসারগণ সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখতকে কাছে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলো। তাদের অধিকাংশই এ দুই ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ দু'জনকে ওরা কেবল শ্রদ্ধাই করতো না, ভালও বাসতো।

সুলতান আইয়ুবী দুই সেনাপতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘এসব কমাণ্ডারকে বলো, দুশমন যুদ্ধের কি প্রস্তুতি নিয়ে আসছে। তাদের আক্রমণের ধারা কেমন হবে। শত্রু সেনারা কতটা আঘাত হানতে পারবে। তাদের সামরিক যোগ্যতা, দক্ষতা কেমন এবং ঈমানী বল কেমন?’

সেনাপতি শামস বখত বললনে, ‘মুজাহিদ কমাণ্ডার ভাইয়েরা! সৈন্য সব সময়ই সৈনিক থাকে। শত্রুদেরকে কমজোর ও আনাড়ী মনে করার কোন কারণ নেই। আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না, যে শত্রুরা আমাদের মোকাবেলায় আসছে তারাও মুসলমান! আমাদের মত তারাও যুদ্ধের ময়দানে পিঠ দেখানোর শিক্ষা পায়নি। সৈনিকদের মধ্যে ইসলামী চেতনা এবং জেহাদী জযবাও আছে। তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, সুলতান আইয়ুবী রাজ্যলিপ্সু এবং খেলাফতের দুশমন। সুতরাং তার বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরজ। ফলে তারা পূর্ণ শক্তি দিয়েই যুদ্ধ করবে।

তাদের মন-মগজে আরো ধারণা দেয়া হয়েছে, সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য অর্থাৎ আপনারা পশুর মত জংলী ও নারী শিকারী। এভাবেই খৃস্টান উপদেষ্টারা তাদেরকে আপনাদের চরম দুশমন বানিয়ে নিয়েছে। শত্রুর মনে আপনাদের ব্যাপারে তাই বিরাজ করছে প্রচণ্ড ঘৃণা।’

সাদ বখত বললেন, ‘তবে আশার কথা হচ্ছে, তারা তিনটি নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন থাকবে। যতদূর জানি, এ তিন নেতার কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। ওরা আমাদের তৎপরতার দিকে যেমন নজর রাখবে, তেমনি নজর রাখবে পরস্পরের প্রতি।

তিনটি দলের নেতাই যুদ্ধে নামছে নিজের আধিপত্য বিস্তারের

জন্য। ব্যক্তি স্বার্থটাই তাদের কাছে বড় কথা। সাইফুদ্দিন ও গুমাস্তগীন দু'জনই নিজের স্বার্থ ও ক্ষমতার নেশায় যুদ্ধ করতে আসছে। এসব সেনাপতির কাছে জীবনের মূল্য অনেক বেশী। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর নেতৃত্বে আমরা যারা ময়দানে নামবো, আমাদের অবস্থা হবে ভিন্ন। জেহাদের ময়দানে আমরা যতটা নির্ভয় ও বেপরোয়া, আমাদের নেতা তারচে অধিক ক্ষিপ্রতা ও দুঃসাহসের সাথে আমাদের পরিচালনা করবেন। জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা জমীনে নয়, আসমানে হয়, এ কথা তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়, দুশমন সঠিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবে না। যে বাহিনীর সেনাপতিরা জান বাঁচানোর জন্য পেরেশান থাকবে, সে বাহিনীর সৈন্যরা কিছুতেই জান কবুল হয়ে লড়াই করতে পারবে না। তবুও আপনাদেরকে খুব সাবধান হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

এবার ওদের যুদ্ধের পরিকল্পনা শুনুন। ওরা আপনাদেরকে এই পাহাড়ী অঞ্চলে অবরোধ করে মারতে চায়। বিজয়ের সম্ভাবনা না দেখলে খৃস্টানরা ওদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে না। রিমাণ্ডের পলায়নে ওদের মনে ভীতি ঢুকে গেছে আপনাদের সম্পর্কে। তাই ওরা সামনে আসতে চায় না। ওদের অবরোধের পরিকল্পনা থেকেই বুঝা যায় জানের মায়া ওদের কত বেশী। ওরা নিজেদের প্রাণ ক্ষয় না করেই যুদ্ধের জয় চায়।

বন্ধুরা, আমি আগেই বলেছি, ওরা তিন বিচ্ছিন্ন দল এগিয়ে আসছে ঐক্যবদ্ধভাবে, কিন্তু এ ঐক্যের পাশাপাশি পরস্পরকে নিয়ে ওদের মনে আছে শঙ্কা, সংশয় ও সন্দেহ। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও

সংশয় যে বাহিনীর সঙ্গী হয় কোনদিন সে বাহিনী জয়ের মুখ দেখতে পারে না।'

সাদ বখতের বক্তব্য তখনও শেষ হয়নি, দূরে কয়েকটি ঘোড়া দেখা গেল। পূর্ণগতিতে তারা ছুটে আসছে আর রিস্তানের দিকে। সাদ বখত কথা থামিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। অন্যরাও তাকালো সেদিকে।

একটু পর। ঘোড়া থেকে নেমে এলেন খতিব ইবনুল মাখদুম, তার কন্যা সায়েকা, কারাগারের দারোগা ও একজন গোয়েন্দা।

সুলতান আইয়ুবী খতিবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে পরামর্শ সভায় যুক্ত করে নিয়ে বললেন, 'মাননীয় খতিব, আল্লাহর শোকর আপনারা এসে পড়েছেন। আমরা দুশমনের তৎপরতা নিয়ে আলাপ করছিলাম। মুশালে কি রকম সামরিক তৎপরতা চলছে আমাদের জানা দরকার। আপনি দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত। আপনি কি এখন একটু বিশ্রাম নেবেন, না এই অফিসার ও কমাণ্ডারদের সামনে বলবেন, ওখানে কেমন সামরিক তৎপরতা চলছে?'

খতিব বিন্দুমাত্র বিশ্রামের ধার ধারলেন না। তিনি বললেন, 'মাননীয় সুলতান, আমার কোন বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। মুশালের যুদ্ধ প্রস্তুতি জানতে চাচ্ছেন? তাহলে শুনুন, মুশালের আমীর এমন এক ব্যক্তি, যে ফালনামা দেখে সিদ্ধান্ত নেয় এবং নারী ও মদ ছাড়া যার সময় কাটে না। এ আমীর কেমন করে তার সৈন্য পরিচালনা করবে?'

খতিব উপস্থিত কমাণ্ডারদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার! যার বুকে ঈমানের লেশ নেই সে যুদ্ধক্ষেত্রে

বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। মুশালের আমীর আমাকে ডেকে নিয়ে বললো, খতিব সাহেব, এ যুদ্ধে আমি সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করবো, নাকি পরাজিত হবো ফালনামা দেখে আমাকে বলে দিন।' আমি তাকে বললাম, 'তোমার এ পদক্ষেপ যেহেতু কোরআনের নির্দেশের বিরুদ্ধে, অতএব তোমার পরাজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। তোমার বাঁচার একটাই উপায়, হয় তুমি মুজাহিদদের সাথে মিশে যাও, নইলে ওদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও।' এ অপরাধে সে আমাকে কারাগারে বন্দী করলো। সে কোরআনকে জাদুর কিতাব মনে করে। আমি আপনাদের কোরআনের কেরামতির কথা শোনাবো, কারণ কোরআনই আমাকে মুশালের কারাগার থেকে বের করে এখানে পৌছে দিয়েছে।'

এরপর তিনি তার মুক্তির কাহিনী বর্ণনা করলেন। বললেন, 'সাইফুদ্দিন আমার মেয়েকেও ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমার বেটিকেও আল্লাহ তার কুদরতি হাতে রক্ষা করেছেন। তাই আমি আপনাদের বলতে চাই, যদি আপনারা কোরআনের নির্দেশের ওপর অটুট থাকেন, আর জিহাদকে ধর্ম ও জাতির স্বার্থে অব্যাহত রাখেন, তবে বিজয় এসে আপনাদের পায়ে চুমু খাবে।

তবে আমি মাননীয় সুলতানের কাছে একটি পরামর্শ রাখতে চাই। আমি জানি, আমাদের প্রতিপক্ষে যে তিনটি শক্তি একজোট হয়ে লড়াই করতে আসছে তারা কেউ কাফের নয়। ওখানকার অধিকাংশ সৈনিককে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। ক্ষমতার মোহে অন্ধ আমীররা সুলতানের নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে সুলতানকে ওদের সামনে উপস্থিত

করেছে ইসলামের দুশমন হিসাবে। ফলে ওরা আমাদের নয়, ইসলামের দুশমনকে পরাস্ত করার জন্য জিহাদের জযবা নিয়ে ময়দানে আসছে।

ওদের এ ভুল ভাঙ্গানোর কোন উপায় এখন নেই। আমাদের উচিত হবে, যত কম সংখ্যক লোক ক্ষয়ের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনা। সত্য উদ্ভাসিত হলে ওদের অনেকেই সপক্ষ ত্যাগ করে আমাদের কাতারে এসে শামিল হবে। এ অবস্থায় সরাসরি লড়াই যত কম করা যায় ততই মঙ্গল।

কমাণ্ডো আক্রমণই এখনকার যুদ্ধ পলিসি হওয়া উচিত। কিন্তু এ পলিসি চালু রেখে ওদের এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে হবে, যেন তারা রাতে শান্তিতে ঘুমাতে না পারে।'

কারাগারের যে দারোগা খতিবকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল, খতিবের পরামর্শে তাকে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করে দেয়া হলো। সুলতান আইয়ুবী পরদিন খতিবকে এবং তার মেয়ে সায়েকাকে দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। মিশর থেকে আসা ফৌজের দায়িত্ব তুলে দেয়া হলো সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখতের হাতে। আরেকটি ব্যাপক সংঘাত ও সংঘর্ষের মোকাবেলা করার জন্য এখন মুজাহিদরা পূর্ণ প্রস্তুত।

####

পরবর্তী বই ক্রুসেড-১৪

তুমুল লড়াই

ক্রুসেড-১৩
পাপের ফল
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন